দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

কেরলে সিপিএমের
হিংসাত্মক কাজের
নিন্দা করল
আর এস এস
পৃঃ - ৩১

ঔপনিবেশিক
আমলের
গোঁড়ামি পরিত্যাগ
করা সময়ের দাবি
পৃঃ - ২৭

৬৯ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।। ১৪ নভেম্বর ২০১৬।। ২৮ কার্তিক - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ২৮ কার্তিক, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

১৪ নভেম্বর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : দিদি তোমায় তালাক, তালাক তালাক...
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

পার্ক সার্কাস ময়দানে সাম্প্রদায়িক সমাবেশের অনুমতি আগুন নিয়ে খেলার শামিল ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করতে অভিন্ন আইনি ব্যবস্থা জরুরি
▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দাবি রাজনৈতিক নয়, আধুনিকতা আর মানবাধিকারের চাহিদার ফল ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১৩

সারা দেশের জন্য একই দেওয়ানি বিধি জরুরি
▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ১৬

নাগরিকত্ব বিল ও মমতার বিরোধিতা
▯ কমল মুখার্জী ▯ ২০

সংকীর্তনে মৃদঙ্গ ও করতাল ▯ শ্রীদেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ২১

যথার্থ গৃহ ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ২২

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

ঔপনিবেশিক আমলের গোঁড়ামি পরিত্যাগ করা সময়ের দাবি
▯ আহতেশ খান ▯ ২৭

সি পি এম এবং ইসলামি জেহাদি আক্রমণ : কেরল ও তামিলনাড়ুতে স্বয়ংসেবকের রক্তপাত অব্যাহত ▯ ২৯

কেরলে সি পি এমের হিংসাত্মক কাজের তীব্র নিন্দা করল সঙ্ঘ ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯

অন্যরকম : ৩৩ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ ▯

সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ ▯ রঙ্গম : ৩৮-৩৯ ▯

শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রকাশিত হবে
২১ নভে. '১৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২১ নভে. '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পাকিস্তানে হিন্দুমন্দির

গত সত্তর দশক ধরে হিন্দুদের হত্যা, বিতাড়ন, সম্পত্তি ও মন্দির ধ্বংসের পর পাকিস্তানে এখনও যে কয়েকটি বিখ্যাত হিন্দু মন্দির টিকে রয়েছে তাদেরই এক-দুটির উপর আলোকপাত করেছেন সন্দীপ চক্রবর্তী। সেইসঙ্গে থাকছে সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্য।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

স্পষ্ট কথাটা এখনই বলিবার সময়

মাস কয়েক আগে পাথর ছুড়িবার ঘটনার মতো কাশ্মীর উপত্যকায় এখন স্কুল পুড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। এই ঘটনা কেন ঘটিতেছে তাহা আমরা এখন ভালোভাবে বুঝিতে পারি। এখন যাহা ঘটিতেছে তাহা বিশ বৎসর আগে কাশ্মীর উপত্যকায় ওয়াহাবি ইসলামি আন্দোলনের শুরুর সময়ের দিনগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা সেই সময় 'আজাদি'-র জন্য আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। এরপর হঠাৎ দেখা যাইল তাহাদের পরিবর্তে শ্মশ্রুশোভিত নতুন একটি দলের নেতৃত্বে ইসলামের নামে অনবগুণ্ঠিত মহিলাদের মুখে অ্যাসিড ছোড়া, মদের দোকান, সিনেমা হল ও ভিডিও লাইব্রেরিগুলি ভাঙচুর, চরার-ই-শরিফের মতো ধর্মস্থানগুলিতে অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটিতেছে।

এইবারের ঘটনায় অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখনও এইসব ঘটিতেছে দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছি। এমনকী সাংবাদিক বন্ধুরা এই ঘটনার পিছনে পুরানো হাতের খেলা দেখিতে পাইতেছেন না। কয়েক মাস আগে হিংসাদীর্ণ উপত্যকায় বুরহান ওয়ানির নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশি রিপোর্টে বর্বরতার কথা উঠিয়া আসিলেও ওই সময়ে পঁচিশটি বিদ্যালয় যে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা প্রকাশ পায় নাই। মাত্র গত সপ্তাহেই আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি। বিশ্ব জুড়িয়া ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে জিহাদ শুরু হইয়াছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংস তাহারই এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অঙ্গ। একমাত্র ভারতে আমরাই তাহা সম্যকভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

ইহার কারণ সম্ভবত ভারতের সংবাদমাধ্যম খিলাফতের সময় হইতে চলিয়া আসা ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলিকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করিতে কোনো রূপ চেষ্টা করে নাই। হাত বা পা দেখা যাইতেছে বলিয়া নারীদের হত্যা কিংবা আরবিক প্রার্থনা ঠিক মতো বলিতে না পারিবার জন্য শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলিকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলির কথা প্রকাশ্যে আসিতে দেওয়া হয় নাই, কেননা ইহার ফলে মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হইতে পারে এই আশংকায়।

উপত্যকায় নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করিয়া পাথর ছুড়িবার জন্য যখন ছোট ছোট ছেলেদের আগাইয়া দেওয়া হইল তখন আক্রমণকারীদের দোষারোপ না করিয়া নিরাপত্তারক্ষীদের দায়ী করা হইল। আহত আক্রমণকারীরা যখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তখন তাহাদের আক্ষেপ—'তাহাদের স্বপ্নকে চুরমার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, শিশুদের ভবিষ্যৎ শেষ হইয়া গেল।' যদি স্কুলগুলিই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের শিশুদের ভবিষ্যৎ কী হইবে—এই প্রশ্নের কোনো অর্থ হয় না। আফগানিস্তানে যখন তালিবানি শাসন ছিল, তখনও ইসলামের বাস্তব রূপটি প্রকাশ করা হয় নাই, কেননা আমাদের দেশের মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হইতে পারে।

সম্প্রতি সৌদি আরবের মসুলে খিলাফতের যে রূপ দেখা যাইতেছে, বর্তমানে কাশ্মীরের ঘটনা তাহারই দেশীয় সংস্করণ মাত্র। ওয়াহাবি ইসলামের একটা প্রধান নীতি হইল কোরানের শিক্ষা ছাড়া আর কিছু শিখিবার নাই। আর এই কারণেই মহিলাদের শিক্ষিত না হওয়াই ভালো। ইতিমধ্যে কাশ্মীর উপত্যকায় এই লক্ষণগুলি দেখা যাইতেছে। এখন উপত্যকায় মহিলাদের দুটি চোখ ছাড়া সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত। অথচ কয়েকবছর আগেও সেখানকার মহিলারা নিজেদের মুখমণ্ডল খোলা রাখিতে ইতস্তত করিতেন না। এই পরিবর্তনের কথাটা কি এখনই বলিবার সময় নয়?

যে দেশ ইসলামের নামে বিভক্ত হইয়াছে তাহাতে তখনই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হই নাই। এই দেশের একাংশ এখনও মেকি ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত যাহারা ওয়াহাবি ইসলামি শাসনকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, এমনকী মুসলমান নারীরা যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হইবে তাহা বুঝিয়াও। এই লোকেরাই তালাক প্রথা বাতিল করিবার বিরুদ্ধে।

কাশ্মীরের মাটি হইতে ভারতের প্রভাব মুছিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র যদি সফল হয়, তাহা হইলে এই দেশের অন্যান্য অংশও মৌলবাদী ইসলামের উর্বর জমিতে পরিণত হইতে আর বেশি দিন সময় লাগিবে কি? এখনই এবং এখনই সর্বশক্তি দিয়া ইহা প্রতিরোধ করিতে হইবে। দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষবীজ আর কোনোভাবেই ছড়াইতে দেওয়া যাইবে না।

সুভাষিতম্

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।। (উপনিষদ)

জীবাত্মা এক এবং অনন্য; কিন্তু প্রাণীতে প্রাণীতে পৃথকভাবে স্থিত বলে মনে হয়। চন্দ্র এক হলেও জলপূর্ণ বহু ঘটে প্রতিবিম্বিত হলে সেই একই চন্দ্রকে বহু বলে দেখা যায়।

বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তায় বিদেশ মন্ত্রকের উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পূর্ব-বাংলাদেশে একের পর এক হিন্দু মন্দির ধ্বংস এবং নিরীহ হিন্দুদের ওপর অযথা আক্রমণে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক বাংলাদেশের ভারতীয় দূতাবাসকে অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করার নির্দেশ দিল। বেশ কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা মুসলমান মৌলবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশন সরেজমিনে তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, সব থেকে খারাপ অবস্থা চট্টগ্রামের নিকটবর্তী এলাকাতে। সম্প্রতি প্রায় ৩ হাজার মুসলমান দুষ্কৃতীর তাণ্ডবে সেখানে ১০০ জন হিন্দু মারাত্মকভাবে জখম হন। অন্তত ১০টি মন্দির ভাঙা হয়, প্রায় শতাধিক বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। দু' ঘণ্টার তাণ্ডবের পর দুষ্কৃতীরা স্থানীয় এক হিন্দু যুবকের ফেসবুক পেজে পোস্ট করে জানায়, 'মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগে আঘাত করার ফল!' কিন্তু হঠাৎ এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কারণ কী? স্থানীয় মুসলমানদের অভিযোগ, মাসখানেক আগে এক হিন্দু যুবক তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি ছবি পোস্ট করেছিল। ছবিতে শিবকে মক্কার প্রধান মসজিদের অধীশ্বর হিসেবে দেখানো হয়। ক্ষুব্ধ মুসলমান জনতা ওই হিন্দু যুবককে হত্যার দাবী জানায়। এর কিছুদিন পর একদল মুসলমান মৌলবাদী হিন্দু পাড়ায় ঢুকে শতাধিক বাড়িতে তাণ্ডব চালায়। দশটি মন্দির ধ্বংস করে। নসিরনগর উপজেলার উপপ্রধান অঞ্জনকুমার দেব বলেন, 'ওরা লাঠিসোটা আর ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছিল। এক পুরোহিত সব অন্তত কুড়িজন আহত হয়েছেন।' পুলিশ এখনও পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মহরমে চাঁদার জুলুম, মল্লারপুরে হিন্দু যুবক খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মহরমের জন্য চাহিদামতো চাঁদা না পাওয়ায় একদল মুসলমান দুষ্কৃতী ইন্দ্রজিৎ দত্ত নামের এক যুবককে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ষোলোদিন কোমায় আচ্ছন্ন থাকার পর সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনাস্থল মল্লারপুর। জেলা বীরভূম। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ময়ূরেশ্বর থানার খরাসিনপুর গ্রামের মহরম কমিটি মল্লারপুরের বাহিনা মোড়ের ব্যবসায়ী গৌতম দত্তের চালবোঝাই লরি আটকে মোটা টাকা চাঁদা দাবি করে। সেইমতো চাঁদা না দেওয়ায় লরির ড্রাইভার এবং খালাসিকে বেধড়ক মারধর করা হয়। কয়েকদিন পর বাহিনা মোড়ে অভিযুক্তদের ঘোরাফেরা করতে দেখে লরির ড্রাইভার ও খালাসি তাদের পাল্টা মারধর করে। এরপরেই খরাসিনপুর গ্রামের মুসলমানরা মল্লারপুর-ময়ূরেশ্বরের রাস্তায় জোট বাঁধতে শুরু করে। সেই সময় পেশায় সাইকেল মিস্ত্রি ইন্দ্রজিৎ দত্ত তাঁর দুই বন্ধু সুকুমার সরকার ও অভিজিৎ মণ্ডলকে নিয়ে মোটরবাইকে চড়ে ফিরছিলেন। অভিযোগ, মোটরবাইক থামিয়ে তাদের বেধড়ক মারধর করা হয়। সুকুমার সরকার আর অভিজিৎ মণ্ডল পালিয়ে বাঁচলেও ইন্দ্রজিৎবাবু পালাতে পারেননি। থানায় লিখিত অভিযোগও করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে মল্লারপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে রামপুরহাট জেলা হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল হয়ে শেষে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইন্দ্রজিৎবাবুর মৃত্যুর খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ইন্দ্রজিৎবাবুর বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছেন। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ প্রথমে তাঁদের দেওয়া হয়নি। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে দত্ত পরিবারের আদি বাড়ি বীরভূম জেলার লাভপুর থানার দাঁড়কা গ্রামে। সেখানে মুসলমানদের অত্যাচারে বসতভিটে প্রায় জলের দামে বিক্রি করে মল্লারপুরে বাস করছিলেন। দাঁড়কা গ্রামের বাড়িতে মাঝে মাঝেই বোমা মারত মুসলমানরা। বাড়িও তারা সহজে বিক্রি করতে দেয়নি। শেষে অনেক কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হলো না। যাদের অত্যাচারে পালিয়ে এসেছিলেন তাদের হাতেই তাঁর সন্তানকে খুন হতে হলো!

তথ্য জানার হয়রানি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তথ্য জানার অধিকার সারা দেশে স্বীকৃত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কেউ যদি কোনো তথ্য জানার জন্য আবেদন করেন তা হলে যার এজলাশে তাঁর আবেদনের শুনানি হবে, সেই তথ্য কমিশনারের নির্ধারিত তারিখ পাওয়ার জন্য তাকে ১১ বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে। অসমে অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে অপেক্ষার মেয়াদ ৩০ বছর। কেরলে অবশ্য মাত্র ৭ বছর। সম্প্রতি ১৬টি রাজ্যে তথ্য কমিশনারদের কাজকর্ম সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে এই তথ্য।

আরও জানা গেছে, সারাদেশে মোট ১ লক্ষ ৮৭ হাজার তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত মামলা শুনানির জন্য অপেক্ষমান। এই হিসেব ২০১৫-র ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যেসব বিভাগীয় আধিকারিক নিয়ম মেনে কাজ করেন না, বিশেষ করে যাদের জন্য সাধারণ মানুষের হয়রানি হয়— আইন অনুযায়ী তথ্য কমিশনার তাদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আদায় করতে পারেন। কিন্তু কোনো এক দুর্জ্ঞেয় কারণে মাত্র ১.৩ শতাংশ ক্ষেত্রেই জরিমানা ধার্য করা হয়। এর জন্য ২৯০ কোটি টাকার সরকারি রাজস্বের ক্ষতি হয়।

স্বস্তিকার প্রচার-প্রতিনিধি সম্মেলনে দেশ-রক্ষার অঙ্গীকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বর্তমানে দেশের সুস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অশান্ত করতে দেশি-বিদেশি চক্রান্তের বিরুদ্ধে এক বিশাল মাপের প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলনে রুখে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করল স্বস্তিকা। প্রবীণরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, ১৯৪৮-এ স্বস্তিকার জন্মলগ্নে, পরে '৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধের সময়, তারও পরে '৬৫ ও '৭১-এ ভারত-পাক যুদ্ধের সময়, '৭৫-এ জরুরি অবস্থা ও '৯২-এ বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের সময় দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে বাঙালিদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরণে স্বস্তিকার যে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল, এই ২০১৬-তে দাঁড়িয়েও সেইরকমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের দিশা দেখালো স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলন। গত ৬ নভেম্বর উত্তর কলকাতায় রঘুমল আর্য বিদ্যালয়ে সারাদিন ব্যাপী আয়োজিত হয় স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলন। রাজ্যের প্রতিটি জেলা এবং অসমের বঙ্গাইগাঁও থেকে বাছাই করা মোট দেড়শো জন স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্টজন মিলিয়ে উপস্থিতি দু'শো ছাড়িয়েছিল। সম্মেলনে এমন ১২ জন প্রবীণ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন যাঁরা গত ত্রিশ বছর ধরে স্বস্তিকার প্রচার প্রসারের সঙ্গে যুক্ত। আবার এমন ১৭ জন উপস্থিত ছিলেন যাঁরা অভিজ্ঞতায় নতুন, গত দু'বছরে স্বস্তিকার প্রচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এই প্রবীণ-নবীনের মেলবন্ধনে স্বস্তিকার প্রচার-প্রতিনিধি সম্মেলন আক্ষরিক অর্থেই হয়ে উঠতে পেরেছিল দেশাত্মবোধ জাগরণের তীর্থক্ষেত্র।

উদ্বোধনী সত্রে প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার তথা স্বস্তিকার অভিভাবক নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য স্বস্তিকার কাজকে ঈশ্বরীয় কর্ম আখ্যা দিয়ে বলেন, জাগতিক কিংবা তামসিক পথে গেলে স্বস্তিকার গ্রাহকসংখ্যা দশ লক্ষ পেরিয়ে যেত। কিন্তু বর্তমান ভোগসর্বস্ব দুনিয়ায় স্বস্তিকা ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইছে। তাই প্রতিনিয়িত তার গ্রাহক সংখ্যাকে ভোগবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন : 'বর্তমান দুনিয়ায় রয়েছে শিকারি দৃষ্টি, অর্থাৎ কী করে দু'টো পয়সা করা যায়। এই শিকারি দৃষ্টি থেকেই আসে বিকারী দৃষ্টি। যে দৃষ্টির অভিশাপ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পরও ক্রমশ পিছনের দিকে ঠেলছে। কিন্তু আমাদের রয়েছে পূজারি দৃষ্টি, যা ভারতবর্ষকে অতীত গৌরব পুনরায় ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করবে।' তাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরেই রাষ্ট্রীয় স্বয়সেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক, বর্তমানে অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ ও স্বস্তিকা প্রকাশন ট্রাস্টের সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত বলেন : 'স্বস্তিকা নিছক নিউজ পেপার নয়, স্বস্তিকা হলো ভিউজ পেপার। স্বস্তিকা তুলসী গাছ। এর প্রতিটি বীজ আরও বহু তুলসী গাছের জন্ম দেবে। দূষিত পরিবেশ শুদ্ধ করবে। এভাবেই আমাদের ভারতীয় আদর্শবাদ চারিদিকে বিস্তৃত হবে। এবং এই বিস্তারের কাজ স্বস্তিকাকেই করতে হবে।' তিনি স্মরণ করিয়ে দেন আমাদের ভুল ইতিহাস পড়ানো থেকে, আর্য-অনার্য তত্ত্বের ভুল ব্যাখ্যা করা থেকে সত্যের পথ দেখিয়েছে স্বস্তিকাই।

সম্মেলনে দীর্ঘদিন ধরে এবং বেশি সংখ্যায় স্বস্তিকা প্রচার-প্রসারের জন্য মালদহ জেলার পরেশ চন্দ্র সরকার, বাঁকুড়া জেলার অবনীভূষণ মণ্ডল এবং যাদবপুর এলাকার বাদল চন্দ্র মণ্ডলকে সম্মানিত করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দীর্ঘদিনের প্রচারক, বর্তমানে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ও বিধানসভার সদস্য দিলীপ ঘোষ উক্ত ৩ জনকে শাল পরিয়ে দিয়ে অভিনন্দন জানান।

এদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের প্রবীণ কর্মকর্তা তথা স্বস্তিকার প্রবীণ অছি সত্যনারায়ণ মজুমদার, জয়ন্ত পাল এবং তিলকরঞ্জন বেরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত প্রচার-প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্বস্তিকার প্রচার-প্রসার আরও কীভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়ে কথা বলেন স্বস্তিকার প্রচার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল। তাঁদের পরামর্শ শোনেন স্বস্তিকার সহ-সম্পাদক সুকেশ মণ্ডল। এদিন সমাপ্তি বক্তব্যে স্বস্তিকার প্রচার প্রসারে প্রতিনিধিদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে আগামীদিনে পত্রিকাটির প্রচার আরও তিনগুণ লক্ষ্যে পৌঁছনোর আহ্বান জানান সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য।

২৫ এনজিও-র লাইসেন্স বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেশের ২৫টি এনজিও-র লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছে। বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন- ২০১০ অনুসারে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করার জন্য এদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ১১,৩১৯টি এনজিও-র বৈদেশিক অনুদান সংক্রান্ত লাইসেন্স বাতিল হয়েছে সময়মতো নবীকরণ না করানোর জন্য। মন্ত্রকসূত্রে জানা গেছে, বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত এনজিও-র সংখ্যা ৩৩,১৩৮টি। তার মধ্যে এবছর ২৭৮১০টি এনজিও-র নবীকরণ বকেয়া ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে গত মার্চ মাসে জানানো হয়েছিল ৩০ জুনের মধ্যে নবীকরণ করে নিতে হবে। যদিও লাইসেন্স বৈধ থাকবে অক্টোবরের ৩০ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু মাত্র ১৬,৪৯১টি এনজিও নবীকরণের জন্য আবেদন করে। ১১,৩১৯টি এনজিও কোনো কাগজপত্রই জমা দেয়নি। তাই কেন্দ্রীয় সরকার তাদের লাইসেন্স বাতিল করে দিয়েছে। নবীকরণের জন্য যারা আবেদন করেছে তাদের মধ্যে ১৭৩৬টি এনজিও-র আবেদনপত্রে ত্রুটি থাকায় তাদের নভেম্বরের ৮ তারিখের মধ্যে নতুন করে আবেদন করতে বলা হয়েছে।

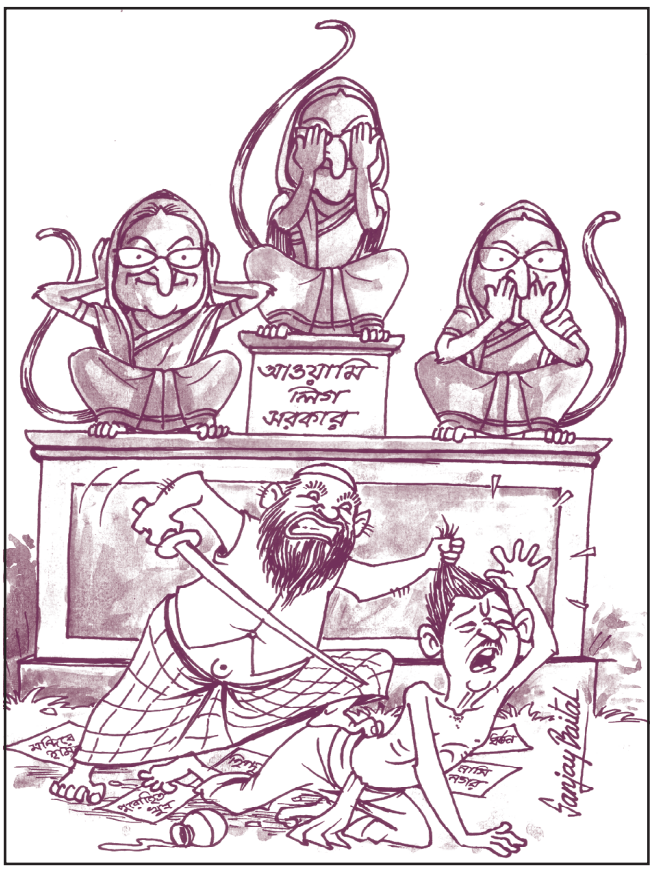

উবাচ

বেঙ্কাইয়া নাইডু
কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-সম্প্রচার মন্ত্রী

“সাংবাদিকরাও নাগরিক। তাঁদের মনে রাখা উচিত বাক্‌স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারলে তবেই তার বৈধ প্রয়োগ করা সম্ভব। এই স্বাধীনতার প্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত না হলে আমাদের দেশের প্রচলিত আইন তাতে হস্তক্ষেপ করবে। আমরা মিডিয়ার ওপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করতে চাই না। সরকার শুধু এইটুকু আশা করে দেশের সব নাগরিক জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে দায়িত্বশীল হবেন।”

সাংবাদিকদের বাক্‌স্বাধীনতা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক বিতর্ক প্রসঙ্গে।

রাজনাথ সিং
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

“যারা গুণ্ডামি করে মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে, (উত্তরপ্রদেশে) বিজেপি ক্ষমতায় এলে আমরা দেখব ওরা মায়ের দুধ কতটা খেয়েছে।”

কইরানায় হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচার প্রসঙ্গে।

মেহবুবা মুফতি
জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী

“আশা করছি আগামী সপ্তাহে কিছু ভালো খবর পাব। স্কুল পোড়ানো সন্ত্রাসবাদের সব থেকে খারাপ দিক। এর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কাউকে ছাড়া হবে না।”

সম্প্রতি কাশ্মীরের ২০টি স্কুলে অগ্নিসংযোগের ঘটনা প্রসঙ্গে।

লতিকা কুমারমঙ্গলম্
জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

“তিন তালাক (তালাক-ই-বিদাত), নিকাহ্ হালাল এবং বহুবিবাহ সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। এইসব প্রথার জন্য মুসলমান মহিলারা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন এবং শেষমেশ যা তাঁদের এবং তাঁদের সন্তানদের চরম ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়।”

সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া জাতীয় মহিলা কমিশনের এফিডিভিট, তিন তালাক প্রসঙ্গে।

দিদি তোমায় তালাক, তালাক, তালাক....

মাননীয় দিদি,

আপনি মহিলা। তাই মুসলমান মহিলারা ভেবেছিল আপনি ওদের কষ্ট বুঝবেন। যুগ যুগ ধরে চলে আসা নির্যাতন থেকে নরেন্দ্র মোদী সরকার তাদের যে মুক্তি দিতে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে সমর্থন দেবেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আপনি উল্টে সেই তালাক প্রথাকে সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু দিদি, ওরাও তো আপনার ভোটার। শুধু কি মুসলমান পুরুষ ভোট নিয়েই আপনি ক্ষমতায়! পশ্চিমবঙ্গকে যে মুসলমান রাজ্য বানানোর পরিকল্পনা আপনি নিয়েছেন তাতে কি শুধু তালাক দেওয়ার মুসলিম মৌলবাদীরাই থাকবে?

কয়েকদিন আগেই সুপ্রিম কোর্ট ইসলাম ধর্মের 'তিন তালাক' প্রথার বিরোধিতা করেছে। আদালত বলেছে, এই প্রথা কোনো ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পেয়েই ভারতের ধর্মমত নির্বিশেষ নাগরিকদের জন্য এক ও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ডি ভি সদানন্দ গৌড়াকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড'-এর বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন কমিশনকে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন। আইনমন্ত্রী বলেছেন, তাড়াহুড়ো না করে দেশের সমস্ত ল' বোর্ডগুলির সঙ্গেই কথা বলার পরেই নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

স্বাধীনতার আগে থেকেই দেশে এই বিতর্ক চলে আসছে। স্বাধীনতার পরে কোনো সরকারই আর এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। এই প্রথম দেশের কোনো সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু শুরুতেই যা আভাস, তাতে দেশজুড়ে বিতর্কের ঝড় বইবে। ইতিমধ্যেই নিজেদের বিরোধিতার কথা জনিয়ে দিয়েছে মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড। তিন তালাকের বিধান উচ্ছেদের বিষয়ে জনগণের মতামত নিতে আইন কমিশন যে প্রশ্নমালা প্রকাশ করেছে, তা বয়কট করা হবে বলে জানিয়েছেন মুসলিম ল' বোর্ডের হজরত মাওলানা ওয়ালি রহমান। তিনি বলেন, ইউনিফর্ম সিভিল কোড এই দেশের জন্য ভাল হবে না। এই দেশে অনেক সংস্কৃতির মানুষ রয়েছেন। তাঁদের অবশ্যই সম্মান দেখাতে হবে। জনগণের উপরে দেশ কোনো একটি মতাদর্শ চাপিয়ে দিতে পারে না।

আজব বিষয়! আজব আবদার! ধর্মের উপরে দেশ মতাদর্শ চাপিয়ে দিতে পারবে না কিন্তু দেশের আইনের উপরে কোনো একটি ধর্মের কিছু মানুষ তাদের মতাদর্শ চাপিয়ে দিতে পারবে! কেনই বা পারবে না? কংগ্রেস এবং তার অবৈধ সন্তান মানে নিয়ম ভেঙে জন্ম নেওয়া দলগুলি যে মুসলিম তোষণের জন্য অন্যায়কে তোষণ করতেও রাজি। ইসলামি আইন অনুযায়ী, স্ত্রীকে তিনবারে তিন তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে স্বামীকে। মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের দাবি, তিন তালাকের বিষয়টি একটি ব্যক্তিগত আইন। সুতরাং তা কেন্দ্র সংশোধন করতে পারে না। কিন্তু দেশের মানুষের নায্য দাবি কার্যকর করাই দেশের সরকারের কাজ। সেটাই তো আইন। কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য আইন নয়। একটা সময়ে সতীদাহ-র মতো ভয়ানক রীতির প্রচলন ছিল হিন্দু সমাজে। আধুনিক মনস্কতা সেই রীতিকে বিসর্জন দিয়েছে। আইন করে সেই অন্যায় বন্ধ করা হয়েছে। মুসলমান সমাজ কি আধুনিক হবে না? মুসলমান রমণীরা কি নিজেদের স্বাধীনতা পাবে না? যুগ যুগ ধরে কি তাদের মৌলবাদী পুরুষের নির্যাতন ও ভোগের শিকার হতে হবে?

বিভিন্ন মুসলমান মৌলবাদী সংগঠন এর প্রতিবাদ করছে। তাবলে সেই প্রতিবাদে সায় দিল একজন মহিলা পরিচালিত দল তৃণমূল কংগ্রেসও!

দিদি, উরিতে জঙ্গি হানা, ভারতীয় জওয়ানদের প্রাণনাশ, প্রতিদিন কাশ্মীর সীমান্তে সাধারণ মানুষের উপরে হামলা এত কিছু ঘটলেও আপনি মুখ খোলেননি। ভোপালে কারারক্ষীকে খুন করে আট সিমি জঙ্গি পালিয়ে গেলও আপনি মুখে আঙুল দিয়ে থেকেছেন। আর দেশের পক্ষে ক্ষতিকর সেই আট জঙ্গিকে খতম করতেই আপনার প্রাণ কেঁদে উঠেছে। রাজ্যে একের পর এক দাঙ্গায় বেছে বেছে হিন্দুদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বড় অন্যায় তো দূরের কথা মুসলমান যুবকেরা হেলমেট না পরে বাইক চালালেও তারা আইনের ঊর্ধ্বে। এত কিছু করে আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের লক্ষ্য— পশ্চিমবঙ্গকে একটি মুসলমান রাজ্য বানানো। জনসংখ্যার বিচারে কয়েকটি জেলায় এখনই হিন্দুরা সংখ্যালঘু।

দিদি, আপনার মুসলমান রাজ্যে কি তালিবানি শাসন চলবে?

—সুন্দর মৌলিক

পার্কসার্কাস ময়দানে সাম্প্রদায়িক সমাবেশের অনুমতি আগুন নিয়ে খেলার শামিল

যে আশঙ্কার কথাটা আগেই বলেছি সেটাই সত্য হতে চলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের প্রশাসন রাজ্যে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের প্রকাশ্য সমাবেশ কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে করার অনুমতি দিয়েছে। তৃণমূল সাংসদ সুলতান আহমেদ জানিয়েছেন ১৯ নভেম্বর থেকে তিন দিনের সম্মেলন হবে কলকাতায়। এর মধ্যে ২০ নভেম্বর পার্ক সার্কাস ময়দানে হবে প্রকাশ্য সমাবেশ। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে লক্ষাধিক সুন্নি মুসলমান সেদিন কলকাতার সমাবেশে যোগ দেবে। রাজ্যের ইমাম মোয়াজ্জেমদের সংগঠনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুসলমান যুবক-যুবতীদের সমাবেশে টেনে আনতে।

কলকাতার সমাবেশের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্যে বিজেপির উত্থানকে রুখে দেওয়া। এটা আত্মঘাতী পরিকল্পনা। কারণ, বিজেপিকে রুখতে গিয়ে হিন্দুদের মুণ্ডপাত করা হবে। ফলে এই রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণ হতে বাধ্য। এমনিতেই পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষীয়মাণ। জীবন, পরিবার ও সম্পত্তি রক্ষার তাগিদে বাঙালি হিন্দু বিজেপির পতাকার তলায় আশ্রয় নিতে চাইবে। আমি নিশ্চিতভাবে আগাম বলতে পারি যে পার্ক সার্কাস ময়দানের সমাবেশে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের উসকে দিতে গিয়ে বক্তারা অতি উৎসাহে হিন্দুদের ধর্মীয় শত্রু বলে ঘোষণা করবে। হিন্দু বিরোধী আবেগকে উসকে দিয়ে সেদিন কলকাতায় শান্তি রক্ষা করা যাবে তো? মনে রাখতে হবে, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার দায় দায়িত্ব ক্ষমতাসীন সরকারের পুলিশ প্রশাসনের। দ্বিতীয় অন্য কারো নয়।

প্রসঙ্গত, একটা কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মুসলানদের তিন-তালাক প্রথা বিলোপ করতে চাইছে এটি ল বোর্ডের মুরুব্বিদের অসত্য প্রচার। কেন্দ্রীয় ল কমিশন সুপ্রিম

গূঢ়পুরুষের কলম

কোর্টের সুপারিশে কিছু চালু ধর্মীয় অনুশাসনের ক্ষেত্রে দেশের সাধারণ নাগরিকদের সুচিন্তিত মতামত জানতে চেয়েছে। ভারতের হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান সমাজের মধ্যে চালু যেসব অনুশাসন নারীস্বার্থ বিরোধী কেবলমাত্র সেইসবগুলিই প্রশ্নের আকারে রাখা হয়েছে। বিবাহিত হিন্দু মেয়েদের পিতৃ সম্পত্তির অধিকার, খ্রিস্টান মেয়েদের বিবাহ বিচ্ছেদের দীর্ঘ সময়কাল এবং মুসলিম মহিলাদের নির্যাতনে তিন-তালাক প্রথার অপব্যবহার, পুরুষের বহু বিবাহের অধিকার ও নিকাহ হালালা ইত্যাদি নিয়ে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড বলছে এইসব প্রশ্ন তোলা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার জন্য। তাই আইন কমিশনের তোলা প্রশ্নের জবাব মুসলমান সমাজ বয়কট করছে। মোদী সরকার ভারতীয় মুসলমান সমাজকে কোণঠাসা করতে চাইছে এমন একটা মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার কথা মুসলমান বুদ্ধিজীবী এবং অত্যাচারিত মুসলমান মেয়েদের। বহু শিক্ষিত মুসলমান পরিবার, বিশেষত শিয়া মুসলমানরা, শরিয়ত মেনে আদর্শ নিকাহনামা তৈরি করেছেন যাতে বিয়ে সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়ের শরিয়তসম্মত অধিকার থাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডই দেশের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি সংগঠন। এটা ভুল ধারণা। ভারতে শিয়া পার্সোনাল ল বোর্ড এবং মুসলিম উইমেন্স পার্সোনাল ল বোর্ড আছে। এঁরা শরিয়ত অনুযায়ী মুসলমান মেয়েদের অধিকার চাইছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে বুঝতে হবে যে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডকে তোল্লাই দিলে মুসলমানদের অন্যান্য সংগঠনকে বিরূপ করা হবে। আবার বলছি, কয়েকজন সুন্নি মুসলমান ইমাম মোয়াজ্জিমদের খুশি করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় সাম্প্রদায়িক সমাবেশ করতে অনুমতি দিয়েছেন। এটি আগুন নিয়ে খেলা করা হচ্ছে। যদি বক্তারা দাঙ্গার উস্কানি দেয় তবে সিদ্দিকুল্লা, রেজ্জাক মোল্লা বা সুলতান আহমেদরা পারবেন বক্তাকে থামাতে? ল বোর্ডের মুরুব্বিরা এর আগে দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌতে সমাবেশ করতে চেয়েছিল। দুটি রাজ্যেরই প্রশাসন সেই আবেদন নাকচ করে দেয়। দিল্লী এবং উত্তরপ্রদেশ এই দুই রাজ্যেই অ-বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আছে। তবু দাঙ্গার ভয়ে তারা সমাবেশ করতে দেয়নি। পশ্চিমবঙ্গই এখন গোঁড়া হিন্দু বিরোধী সুন্নি মুসলমানদের একমাত্র বেহেস্ত। তাছাড়া মমতা এখন বিজেপি বিরোধী জাতীয় ফেডারেল ফ্রন্ট গড়ার স্বপ্ন দেখছেন। মুসলমান ভোটারদের পূর্ণ সমর্থন পেতে মমতা তাই মরিয়া। কিন্তু গরিব ঘরের বিবাহবিচ্ছিন্না মুসলমান মহিলাদের চোখের জল মমতার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে কাঁটা বিছিয়ে দেবে। ■

সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করতে অভিন্ন আইনি ব্যবস্থা জরুরি

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি আমাদের সুপ্রিম কোর্ট একটা চাঞ্চল্যকর রায়ের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, শরিয়ত আইন আদৌ সাংবিধানিক নয়। তার মতে, কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে শরিয়তি আইনে শাস্তি দেওয়া বা কারও বিরুদ্ধে 'ফতোয়া' দেওয়ার আইনি ভিত্তি নেই। এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না বলেও এই আদালত জানিয়ে দিয়েছে।

দুই বিচারপতির বেঞ্চের তরফ থেকে মাননীয় কে. সি. প্রসাদ মন্তব্য করেছেন— শরিয়তি আইন সংবিধানসম্মত নয়, কারণ এই ধরনের সংস্থার আইনত কোনো ভিত্তি নেই— 'There is no doubt that such a court has no legal status।' এই আদালত আরও জানিয়েছে— এমন কোনো ধর্ম নেই যার দ্বারা কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যায় এবং ইসলাম ধর্মও এর ব্যতিক্রম নয়। তার ফলে এই ধরনের সংস্থা দ্বারা মানবাধিকারও লঙ্ঘন করা যায় না। আদালতের মতে, 'In some cases, orders were passed by them which violate human rights and punish innocent persons. No religion, including Islam, allows punishment of innocent persons।'

শীর্ষ আদালত পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে যে, 'দারুল কাজি' জাতীয় সংস্থার কোনো সাংবিধানিক অস্তিত্ব নেই এবং তার জন্যই তার বিচার ক্ষমতা থাকতে পারে না— 'Shari courts cannot be sanctioned by law and there is no legality of 'fatawas' in this country।'

আসলে, ভীষ্মলোচন নামে এক আইনজীবী একটা মামলা এনে জানিয়েছিলেন যে, শরিয়তি আদালতগুলো সমান্তরাল ভাবে আমাদের স্বীকৃত আদালতের পাশাপাশি বিচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে— তাতে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার ব্যাহত হয়। তাঁর মতে, 'দারুল-কাজি', 'দারুল-ইফ্‌তা' প্রভৃতি সংস্থা বিচারের নামে নিরপরাধ ব্যক্তিকেও সাজা দেয়— এটা চলতে পারে না।

বলা বাহুল্য, শীর্ষ আদালত এই বক্তব্য মেনে নিয়ে উপরোক্ত রায় ঘোষণা করেছে। এই আদালতের মতে, এই সব সংস্থার কাজি, মুফ্‌তি প্রমুখ ব্যক্তি নিষ্পত্তির নামে ব্যক্তিগত মত জানান— 'রায়' দেওয়ার কোনো আইনগত ক্ষমতা তাদের নেই, কারণ তাঁরা রাষ্ট্রনিযুক্ত 'বিচারক' নন। এটাও লক্ষণীয় যে, অনেক সময় তাঁরা উদ্ভট ও অযৌক্তিক 'ফতোয়াও' দিয়েছেন। যেমন, একটা ক্ষেত্রে ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল যে, জনৈকা নারী তাঁর শ্বশুর-দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিলেন বলে স্বামী ও সন্তানদের ত্যাগ করে শ্বশুরের সঙ্গেই তাঁকে স্ত্রী হিসেবে থাকতে হবে। এমন ফতোয়া শুধু মানবতাবিরোধীই নয়, আমাদের আইনি ব্যবস্থায় এর কোনো স্থানই থাকতে পারে না।

এটা লক্ষণীয় যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এই রায়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন। খালিদ রসিদ ফারাঙ্গি জানিয়েছেন যে, আমাদের সংবিধান অনুসারে তাঁদের শরিয়তি নিয়ম মেনে চলার পূর্ণ অধিকার আছে। অনুরূপভাবে মৌলানা মহম্মদ সাজিদ রসিদ মনে করেন, এই রায়ের দ্বারা তাঁদের ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে, পাটনার মৌলানা আনিসুর রহমান উক্ত রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন, কারণ এতে তাঁদের ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়নি।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে।

প্রথমত, আমাদের সংবিধান সুপ্রিম কোর্ট (১২৪ নং অনুচ্ছেদ), হাইকোর্ট (২১৪ নং অনুচ্ছেদ), জজ কোর্ট (২৩৫ নং অনুচ্ছেদ) সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া রাষ্ট্র আইন-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছে সাব্ জজ কোর্ট, ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, সিটি সিভিল কোর্ট, স্মল জজেস কোর্ট, ব্যাঙ্কশাল কোর্ট, ন্যায় পঞ্চায়েত ইত্যাদি। কিন্তু সংবিধান বা রাষ্ট্র কেউই শরিয়তি কোর্ট তৈরি করেনি বা তাদের স্বীকৃতি দেয়নি। আর মুফ্‌তি, ইমাম, কাজি প্রমুখ ব্যক্তিরা ধর্মগুরু; বিচারক নন। তাঁদের কাজ হলো ধর্মীয় ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া--- সামাজিক বিরোধের মীমাংসা করা নয়।

দ্বিতীয়ত, 'আইন' হলো বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুন এবং সেগুলো সেই জন্যই

এজেন্ট হওয়ার জন্য

অন্তত পাঁচ কপির কম স্বস্তিকার এজেন্সী দেওয়া হয় না। প্রতি কপি স্বস্তিকার জন্য ৩০.০০ টাকা হিসাবে অগ্রিম জমা অবশ্যই রাখতে হবে।

প্রতি মাসের বিলের বকেয়া টাকা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় এজেন্সী বাতিল হতে পারে।

স্বস্তিকা ডাক, রেল ও সড়ক পরিবহন দ্বারা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। ২৫ কপির কম পত্রিকা রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পাঠানো যাবে না। রেল বা সড়ক পরিবহন সংস্থার মাধ্যমে পত্রিকা নিতে ইচ্ছুক এজেন্টকে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বা পরিবহন সংস্থার নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর জানাতে হবে।

নতুন এজেন্ট হলে অগ্রিম জমার টাকা সমেত সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।

আরও বিস্তারিত জানতে স্বস্তিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

— ব্যবস্থাপক

বলবৎযোগ্য। কিন্তু শরিয়তি নিয়মগুলো রাষ্ট্রদ্বারা বিধিবদ্ধ বা স্বীকৃত নয়। সেগুলো মুফ্‌তি, কাজির ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত— সেগুলো বলবৎযোগ্যই নয়।

তৃতীয়ত, আমাদের সংবিধান তৃতীয় অধ্যায়ে ছয় ধরনের মৌলিক অধিকার ব্যক্তিকে দান করেছে। এগুলো 'মৌলিক' এবং বলবৎযোগ্য। ১৩ (২) নং অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো আইন এগুলোকে ক্ষুণ্ণ বা ব্যাহত করতে পারে না--- সেক্ষেত্রে আইনটাই বাতিল হয়ে যাবে। তাই যদি হয়, তাহলে শরিয়তি নিয়ম-কানুনের সেই সুযোগ আরও কম। উক্ত ভাবনায় সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছেন— 'No religion is allowed to curb anyone's fundamental rights।'

আসলে, এই রায়ের দ্বারা কারও ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়নি, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করার ব্যাপার ঘটেনি। দুর্গাদাস বসুর মতে, ব্যক্তি ও তাঁর ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্কটা ধর্মীয় ব্যাপার--- তাতে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় বিষয়, 'আইনই' সেটা নির্ধারণ করবে— (ইন্ট্রোডাক্‌শান টু দ্য কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃ. ১০৩)। কিন্তু মুসলমান সমাজে উত্তরাধিকার, বিয়ে, বিবাহ-বিচ্ছেদ, দ্বি-পাক্ষিক বিরোধ, পারিবারিক কলহ ইত্যাদি সবই শরিয়তি নিয়মে চলে। এভাবে ধর্ম, রাজনীতি, সামাজিক সম্পর্ক সব মিশে গেছে— (ড. জে. সি. জেপুরী— ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, পৃ. ২৮৪)।

তাৎপর্যের বিষয় হলো, আমাদের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর পছন্দ অনুসারে ধর্মমত গ্রহণ, রীতি- অনুসরণ ও প্রচারের ('profess, practise and propagate') অধিকার দিয়েছে। আর ২৬, ২৭ ও ২৮ নং অনুচ্ছেদ দিয়েছে ধর্মীয় ব্যাপারে সাম্যের অধিকার। রচয়িতারা চেয়েছেন ধর্ম বিভিন্ন ধরনের হোক, কিন্তু আইন হবে এক ও অভিন্ন। ৪৪ নং অনুচ্ছেদ জানিয়েছে— রাষ্ট্রকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা 'uniform civil code' তৈরি করতেই হবে :

"আমাদের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর পছন্দ অনুসারে ধর্মমত গ্রহণ, রীতি- অনুসরণ ও প্রচারের ('profess, practise and propagate') অধিকার দিয়েছে। আর ২৬, ২৭ ও ২৮ নং অনুচ্ছেদ দিয়েছে ধর্মীয় ব্যাপারে সাম্যের অধিকার। রচয়িতারা চেয়েছেন ধর্ম বিভিন্ন ধরনের হোক, কিন্তু আইন হবে এক ও অভিন্ন।"

কিন্তু সংবিধান গৃহীত হওয়ার এত বছর পরেও সেটা হয়নি উক্ত সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণে। অথচ হিন্দু, পার্সি, শিখ ইত্যাদি সব সম্প্রদায়ের মানুষকে একই আইনের আওতায় আনা হয়েছে ধাপে ধাপে। ডিয়েঙ্গডে বনাম চোপরার মামলায় (১৯৮৫) সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছিল— 'the time has come for the intervention of the legislature in these matters।' সরলা মুদগল বনাম ভারত-সরকারের মামলায় কুলদীপ সিং মন্তব্য করেছিলেন— ৮০ শতাংশ মানুষের জন্য তৈরি হয়েছে বিধিবদ্ধ আইন, সেক্ষেত্রে 'there is no justification whatsoever to keep in abayance any more introduction of uniform civil code।' কিন্তু বিবাহ, বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, নারীর মর্যাদা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে মুসলমান সম্প্রদায় চলে শরিয়তি নিয়মে। ড. হরিহর দাস লিখেছেন, মুসলমান দেশগুলোতে শরিয়তি আইনকে সংশোধিত ও আধুনিক করা হয়েছে। কিন্তু 'the vested interest among the Indian Muslims are grided by medievalism'— (ইন্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৪০৯)।

কিন্তু আর দেরি নয়। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় শাহবানো মামলায় (১৯৮৫) মন্তব্য করেছিলেন— 'But a beginning has to be made, if the constitution is to have any meaning।' তাঁর মতে, দেশের ঐক্যসাধন এর দ্বারা করা যাবে।

অনেক বছর কেটে গেছে--- যদি সংবিধানের মর্যাদা রক্ষা করতে হয়, তাহলে অভিন্ন আইনি ব্যবস্থা নিতেই হবে। ■

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির দাবি রাজনৈতিক নয় আধুনিকতা আর সমানাধিকারের চাহিদার ফল

ড: অচিন্ত্য বিশ্বাস

ভারতের পবিত্র সংবিধানের ৪৪ তম অনুচ্ছেদে একটিমাত্র বাক্য লিখিত হয়েছে; সুস্পষ্ট নির্দেশ সেটি— ভুল বোঝা বা বোঝানোর কোনো উপায় নেই। আলোচনার শুরুতে সেই বাক্যটি উল্লেখ করছি : 'The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.' (Directive Principles of State Policy— শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়)। সুতরাং আজ যে বিতর্ক ঘনিয়ে উঠেছে— অভিন্ন দেওয়ানি লাগু করতে চাওয়ায় যে হৈচৈ শুরু হয়েছে কেন্দ্র-সরকারের বিপক্ষে, তার কি কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি আছে? এক কথায় উত্তর : না। তবু কেন এই উদ্যোগে বাধা দেওয়া হচ্ছে? বাধা দিচ্ছেই বা কারা? বাধা দিচ্ছে বিরোধী কংগ্রেস আর তাদের সহযোগী কিছু দেশবিরোধী, আধুনিক রাষ্ট্রনীতির পরিপন্থী, মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী অপশক্তি আর অবশ্যই ধর্মান্ধ ইসলামের নামে গড়ে ওঠা ঘোর পুরুষবাদী কিছু সংগঠন--- এগুলি মোল্লা-মৌলভিদের দল। কাজী নজরুল ইসলাম হলে বলতেন 'দেওবন্দি' 'মৌলোভী'-র দল।

'সারা ভারত মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ড' বিরোধিতায় মেতেছে। মুখে বলছে— 'Islam has no conflict with a civil code' (সাদাখ মুন্সি নামক স্বঘোষিত এক নেতা) কিন্তু তারা ওই উদ্যোগ মানছেন না কারণ এতে নাকি শাসকদলের পক্ষ থেকে রাজনীতি আনা হচ্ছে; তাঁদের আপত্তি এই রাজনীতি-করণের ('politicising') বিরুদ্ধেই! বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, তারা

মুসলমান তোষণের প্রতিমূর্তি। (ফাইলচিত্র)

সংবিধানের ৪৪ ধারা মেনে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করতে চায়। শুধু যে নানান ধর্ম, জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য এই বিধি চালু করা উচিত তাই নয়— এর মাধ্যমে মুসলমান-নারীরা পাবেন পরিত্রাণ। তাঁরা যেসব ঘৃণ্য, মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার শিকার হয়ে পুরুষদের হাতে পারসোনাল ল' বোর্ড-নামক বিচিত্র সংস্থার প্রশ্রয়ে নিত্য অত্যাচারে পীড়িত হন; অনুরূপভাবে অন্য কোনো ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীতেও এরকম অব্যবস্থা ঐতিহ্যের নামে থাকতে পারে--- সেসব ক্ষেত্রেও অত্যাচারের মোলায়েম লক্ষ্য (soft target) নারীসমাজই;— এ কথাটি দ্ব্যর্থহীন ভাবে তখনই ঘোষণা-পত্রে লেখা হয়েছিল। একটু শোনাই— 'gender equaity'-র জন্য 'ট্র্যাডিশন'কে পাশে রেখে তারা চান সাম্য-সমানাধিকার ও আধুনিক জীবননীতি; নারী-সমাজকে সমতায় আনা (harmonising them), আধুনিকতায় মুক্ত আকাশের তলে দাঁড় করাতে যাওয়া (with the modern times)। এই প্রতিশ্রুতি ছিল সেরকম— এখানে রাজনীতি কোথায়?

এইসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে এসেছে এনডিএ সরকার। সুতরাং প্রতিশ্রুতি পালনের লক্ষ্যে তারা এগোলে তাদের কোনো ভাবেই রাজনীতি করছেন বলে আপত্তি জানানো যায় না। যাঁরা এটা করছেন তাঁরা সংবিধান-বিরোধী, মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথার পক্ষপাতী, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুসলমান-তোষণই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আসাদুদ্দিন কুরেশি থেকে শুরু করে দেশের সর্বত্র হৈ হৈ রৈ রৈ শুরু করেছেন ছোট বড় মাঝারি নেতা ও মোল্লা-'মৌলোভী'র দল। পশ্চিমবঙ্গ এখন মুসলমান মৌলবাদীদের পরম আশ্রয়। অদূরদর্শী অপদার্থ মতলববাজ রাজনৈতিক শক্তি শুধুমাত্র ভোটের লক্ষ্যে এদের রক্ষা করে চলেছে; তোল্লাই দিচ্ছে। খাগড়াগড় -কালিয়াচক- চোপড়া- ইসলামপুর -খাগড়াগড় -উলুবেড়িয়া- বাটানগর-ক্যানিং-হাজিনগর একের পর এক বিস্ফোরণ, দুর্গামূর্তি ভাঙা— দাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে; সর্বত্রই পুলিশ দায়িত্বজ্ঞানহীন—

হিন্দুদের প্রতিবাদকে অঙ্কুরে বিনাশ করার কাজে অতি সক্রিয়। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর তাঁরা প্রমাণ লোপাট করার কাজ সুচারুভাবে করেছেন; রাজনৈতিক নেতারা এন আই এ তদন্ত বিরোধিতা করার জন্য বর্ধমানের রাস্তায় নেমেছেন। শাসক আর শান্তিরক্ষকদের মূঢ় প্রশ্রয়ে বেড়েছে মুসলমান মৌলবাদী শক্তি, পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়েছে।

প্রতিবেশী বাংলাদেশে অবস্থা এতটা একতরফা নয় সম্ভবত। রাজাকার স্বাধীনতাবিরোধী অন্ধকারের শক্তি— যারা শত সহস্র বাঙালি নারীর লাঞ্ছনা-ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের নায়ক, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পাকিস্তানের স্বার্থে নস্যাৎ করতে চেয়েছে; তাদের বিচার হচ্ছে--- শাহবাগ-আন্দোলনের দাবি অনুযায়ী কারো কারো ফাঁসিও কার্যকর হচ্ছে। পাশাপাশি আছে ব্লগার-হত্যা, সংখ্যালঘু পীড়ন, পুরোহিত-পূজারিদের হত্যা করার মতো ঘটনাও। পশ্চিমবঙ্গে একতরফা মৌলবাদী তোষণ ও মৌলবাদীদের আস্ফালনটুকুই দেখা যাচ্ছে। যে বদমতলবি নেতার ডাকে বাংলাদেশের জামাত-নেতার ফাঁসির বিরুদ্ধে জামায়েত আর পুলিশের উপর হামলা হলো তার সভায় মুখ্যমন্ত্রী হিজাব পরে বসে পড়লেন— তিনি এখন মুখ্যমন্ত্রীর মন্ত্রীসভা আলো করে আছেন! একজন মৌলবাদী, এই সেদিনও বাংলাদেশে থাকতেন— ধুবড়ি হয়ে মৌলবাদী সংগঠনে বিলকুল হাত পাকিয়ে গড়েছেন সিমি (Students Islamic Movement of India) তিনি এখন শাসকদলের রাজ্যসভার সদস্য। একতরফা মৌলবাদের প্রতি নরম মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া গেছে আরও অনেক। কালিয়াচক আর হাজিনগর নিয়ে লিখলে লেখা অনেক বড়ো হয়ে যাবে। যে রাজ্যে হিন্দু মন্ত্রীরা আল্লার নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন (সঙ্গে 'অশ্বত্থামা হত ইতি'-র মতো করে ঈশ্বরের নাম করেন) আর মুসলমান মন্ত্রীরা অকপটে আল্লার নামই শুধু গ্রহণ করেন (তারা তো খাঁটি মুসলমান— অতএব)! —সে রাজ্যে এসব লিখে কী আর হবে।

বাংলার মুসলমান-তোষণে বামপন্থীরা কম যাননি। তাঁদের আমলেই গড়ে উঠেছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। নামেই সংখ্যালঘুদের জন্য, কিন্তু মুসলমানরাই এখানে সর্বেসর্বা। কলাম-লেখিকা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িতা তসলিমা নাসরিনের একটি বইয়ের অংশ বিশেষ নিষিদ্ধ করে বামপন্থীরা তাদের জাত চিনিয়েছেন। তারপর দেখেছি— টালিগঞ্জের এক উর্দুভাষী ধর্মনেতা (যার পক্ষে নাসরিনের বাংলা সাহিত্য এক বর্ণ পড়া সম্ভব নয়)-র হুঙ্কার আর বর্তমান শাসকদলের কয়েকজন নেতার গুণ্ডামির পর তসলিমাকে কলকাতা থেকে বিতাড়িত হতে হলো!

'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ড' উচ্চতম বিচারালয়ের অনুরোধে 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' নিয়ে কোনো মত দিচ্ছে না— কলকাতায় এসে মিটিং মিছিল করছে। একটি ফেস্টুন দেখলাম তাদের— মুসলিম মহিলাদের সংগঠনের তরফে— একজন মহিলাকেও দেখা গেল না! এই বর্বরেরা নিজেদের সমাজের মহিলাদের পীড়ন-দমন-দলন করেই শান্ত নয়--- রাজনৈতিক টানাপোড়েনে নিজেদের 'প্রেসার-গ্রুপ' হিসাবে তুলে ধরতে ধুরন্ধর চাল চালছে! পশ্চিমবঙ্গের নির্লজ্জ শাসকরা 'গোষ্ঠমামা' হয়ে ধামা পেতে বসে আছেন— ভোটবাক্স ভরে দেবে মুসলমানের দল। দেশ উচ্ছন্নে যাক— মসনদে তো বসা যাবে!

উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মুসলমান মহিলারা পথে নেমেছেন। ইয়াসমিন বিধি বা রূপা পারভিনের মতো মহিলারা প্রকাশ্যে 'অভিন্ন দেওয়ান বিধি'র পক্ষে বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহ করছেন— কিন্তু মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা 'তিন তালাক'কে সমর্থন করছেন, বহু বিবাহকে সমর্থন করছেন! সেদিন একটি জাতীয় চ্যানেলে 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া'-র অধ্যাপক ড. ইফতিকার মো. খান আর কলকাতার একটি জনপ্রিয় চ্যানেলে মুক্তবুদ্ধি নারী-কর্মী মীরাতুন নাহার বললেন তালাক-প্রথা একটি 'সুন্দর ব্যবস্থা'! বুঝুন একবার। যে প্রথার ফলে মোবাইল ফোন, ইনটারনেটের মাধ্যমে তালাক দেওয়া হচ্ছে— তা 'সুন্দর ব্যবস্থা'! যে জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে দেশের ৫০ হাজার মুসলমান নারী গণস্বাক্ষর করে আপত্তি জানাচ্ছে, তাকে উপাদেয় ব্যবস্থা বলে মীরাতুন নাহার তাঁর আসল রূপের ঝলক দেখালেন বটে।

'কোরান শরিফে' কি তালাক-কে সমর্থন করা হয়েছে? না। সূরা বাকারা-র ২ : ২৪১-এ স্পষ্ট লেখা আছে : 'তোমরা বিয়ে কর কিন্তু তালাক দিও না। কেন না তালাক দিলে আল্লার আরস কেঁপে ওঠে।' সুতরাং প্রথাটিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা আধুনিক দেশ ও সমাজ- নির্মাণের পরিপন্থী। ভারতীয় রাষ্ট্র— আইন ব্যবস্থা একে আর কতদিন সহ্য করবে? এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের আন্দোলন গড়ে ওঠা উচিত।

'ল' কমিশন' সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা নিযুক্ত একটি সাংবিধানিক সংস্থা। এর সঙ্গে বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসকবর্গের কোনো সম্পর্ক দেখানো অসম্ভব। ১৮৩৪ সালে এটি তৈরি হয়! তখন তো কোম্পানির শাসন! ১৯৫৫ সালে লোকসভায় ল' কমিশন বিধিবদ্ধ করা হয়। তখনও বিজেপির শাসন ছিল না। সুতরাং এই ব্যাপারে— সব ধর্ম গোষ্ঠীর কাছে চিঠি দিয়ে ল' কমিশনার বিচারপতি বলবেত সিং চৌহান যে জানতে চেয়েছেন : সংবিধানের ৪৪ তম অনুচ্ছেদ সম্পর্কে তাদের কী অভিমত, তাতে কোথাও রাজনীতি খোঁজা আসলে বর্বর-প্রথাটি টিকিয়ে রাখার জন্যই হীন ষড়যন্ত্র— অন্য কোনো ব্যাখ্যাই অসম্ভব। ল' কমিশন গড়ে ওঠার সময় আইনে একে স্পষ্টভাবেই 'independent'-সংস্থা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের মানবাধিকার কর্মী, বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বা কংগ্রেস ও তা থেকে বের হওয়া বিচিত্রসব রাজনৈতিক দল নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করেন। খবরের কাগজগুলিও এককাঠি সরেস। তারা কি জানেন ইংলন্ডের 'National Secular Society' ভারতের এই বিতর্কে কোন অবস্থান নিয়েছে? ২৭ অক্টোবর ২০১৬ বেলা ২টো ৭ মি. তাদের ব্লগে ছাপা হয়েছে : 'India debates replacing religious laws with one secular law for all ? সে লেখার ছত্রে ছত্রে এদেশের মুসলমান

নারীদের দুর্দশার কথা ছাপা হয়েছে। কথাটি ভুল নয়— উত্তরাখণ্ডের সায়রাবানো তিন তালাকের বিরুদ্ধে মামলা লড়েছেন। তাঁর দাবি তিন তালাক প্রথা ইসলাম ধর্মসম্মত নয়— 'তালাক-ই-বাইয়ত'-কে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছেন তিনি। আফসা বিবি নামক সাহসী মহিলা সায়রাবানোকে সমর্থন করেছেন। মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্ট-এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার, ল' কমিশন আর বিভিন্ন ধর্ম গোষ্ঠীর মতামত চেয়েছেন। এখানে রাজনীতি নেই। আছে সমানাধিকারের চাহিদা, আধুনিকতা আর সংবিধানের সমর্থন। সব ধর্মই মত দিয়েছে— মুসলমানরা ছাড়া। মুসলিম পারসোনাল ল' বোর্ড আর জমিয়ত উলেমা মত না দিয়ে পথে নেমেছে। তাদের পথে কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অশিক্ষিত-অভব্য-আকাট-মৌলবাদী শাসকদল। অনেকের নিশ্চয় মনে আছে ১৯৮৫-র শাহবানো মামলার কথা। শাহবানো দীর্ঘ আইনি সংগ্রাম শেষে স্বামীর কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলায় সিভিল-বিধি অনুযায়ী খোরপোষ পাবার অধিকার পেয়েছিলেন। তাঁর সেই বিজয়ের আনন্দে জল ঢেলে দিয়েছিল তদানীন্তন কংগ্রেস দরকার। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মন্ত্রীসভায় তালাক-প্রাপ্ত মহিলারা সিভিল-বিধিতে মামলা করার অধিকার পাওয়ার বিরুদ্ধে আলোচনা হয়— আর, লোকসভার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জেরে সেই আইন বলবৎ হয়ে যায়। আজও কংগ্রেস দল (আর যারা মুসলমান-ভোট পাওয়ার প্রতিযোগিতায় নাচচ্ছেন লাফাচ্ছেন) একই ভাবে মৌলবাদীদের সমর্থন করে চলেছেন!

১৯৬১ সালে গোয়া ছেড়ে চলে যায় পোর্তুগিজরা। তখন থেকেই সেই রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চলছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা কোনোদিন ব্যক্তিগত আইনের আশ্রয় দাবি করেননি। মিজোরাম-নাগাল্যান্ডেও সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী— তারা কখনো বিচারালয়কে চার্চ-নিয়ন্ত্রিত করতে চান না। কেরল রাজ্যে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে বাস করলেও তারা কোনোদিন অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতা করছেন না। তাহলে কেন কেবলমাত্র মুসলমান সমাজের নেতাদের মধ্যে এই আশ্চর্য অসংবিধানিক দাবি? এর একটাই কারণ স্বাধীনতার পর থেকেই সামান্য কিছু ব্যতিক্রমী পর্ব ছাড়া কংগ্রেস-শাসনাধীন ভারতে মুসলমানরা সর্বদাই বিশেষ সুবিধা পেয়ে আসছেন। একথা সামাজিক ও আইন সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি; অর্থনৈতিক দিকটি এখানে বিবেচ্য নয়। সাচার কমিটি'র প্রতিবেদন কিংবা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসাদ মণ্ডলের নেতৃত্বে গড়া ও.বি.সি. কমিশনের প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে অর্থনীতি ও চাকরি নিযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলমানরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছিয়ে আছেন। পিছিয়ে থাকার জন্য তাদের জীবন-নীতি, জীবন-দৃষ্টি, বহু-বিবাহ, পারিবারিক জীবনে পুরুষ প্রাধান্য, বহু সন্তান জন্মানো, আধুনিক শিক্ষা বর্জন করে মধ্যযুগীয় মাদ্রাসা-মক্তবের শিক্ষা প্রভৃতি কতখানি দায়ী তা মণ্ডল বা সাচার লক্ষ্য করেছেন কিনা জানার উপায় নেই। তার উপর নানা রাজ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশকে অনগ্রসর বলে দেখিয়ে তাদের তোষণ করার জন্য সংরক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত মুসলমানই এই সুযোগ পাচ্ছেন; বিগত বাম সরকার আর বর্তমান শাসক দলের মধ্যে এই তোষণমূলক ব্যাপারে কোনোরকম ইতর-বিশেষ নেই।

অনগ্রসর বলে মুসলমানদের সংরক্ষণ দেওয়া একান্তভাবেই সংবিধান বিরোধী উদ্যোগ। মুসলমানরা দাবি করেন, তাদের মধ্যে জাতিভেদ নেই— সব মুসলমান সমান; সুতরাং তাদের একাংশ সংরক্ষণের সুযোগ পেতে পারেন না। হিন্দু ধর্মেই বর্ণ ও জাত ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা যত দ্রুত সম্ভব দূর করতে হবে। তা যতক্ষণ না সম্ভব হচ্ছে সংরক্ষণ ব্যবস্থা মেনে নেওয়া গেলেও কোনো অবস্থাতেই অন্য কোনো ধর্মভুক্ত মানুষ এর সুযোগ কোনো যুক্তিতেই পেতে পারেন না। সংবিধানের ৩৪০ ধারায় এর কোনো সুযোগই নেই।

এইরকম নানান সুবিধা পেতে পেতে মুসলমানরা বুঝেছেন তারা এদেশে প্রায় সব রাজনৈতিক দলেরই অতি প্রয়োজনীয় ভোটব্যাঙ্ক। আর তাই তারা যখন খুশি যেমন খুশি সিদ্ধান্ত নিয়ে গোলমাল পাকিয়ে, চাপ সৃষ্টি করে স্বার্থরক্ষা করে আসছেন। এই ধর্মান্ধ স্বার্থপরতা আজ এখন পর্যায়ে যাচ্ছে যে তারা না মানছেন সংবিধান না মানছেন সুপ্রিম কোর্টের অনুরোধ— উপরন্তু জমায়েত করে রক্তচক্ষু দেখিয়ে আস্ফালন হুঙ্কার দিয়ে সকল শান্তিপ্রিয় নাগরিক এমনকী প্রশাসনকে ভয় দেখিয়ে চলেছেন। তাদের জানা উচিত এই ব্যবস্থা চলতে পারে না। কেন্দ্র-সরকার সংখ্যালঘুদের জীবন-মান উন্নয়নের জন্য বহু পদক্ষেপ নিয়েছে— নেতারা যদি সত্যি চান, তাদের সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থনৈতিক অবস্থা বদলাতে পারেন এইসব কার্যক্রমের সাহায্য নিয়ে। তা না করে মতলববাজি করলে তাদের কিছুমাত্র লাভ হবে না। কারণ খুব স্পষ্ট, বর্তমান সরকার ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়।

পৃথিবীর ৬০ শতাংশ মুসলমান দেশে তালাক-প্রথা নিষিদ্ধ। ২২টি দেশে এই প্রথা নেই— সেসব দেশে মুসলমানরা বিপন্ন একথা বলা যায় না। তালাক প্রথা বাতিল হয়েছে পাকিস্তানে, বাংলাদেশেও। আর ভারতে চলছে এর সমর্থনে হট্টগোল! গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বেলা ১১টা ১৪-তে ইংলন্ডের 'National Secular Society'-র ব্লগে লেখা হয় 'Sharia divorce better than murdering unwanted wives, says Muslim Law Board ? সত্যি তো, এক সঙ্গে চারজন বিবি রাখার অধিকার, সে তো কোরান-নির্দিষ্ট পবিত্র কর্তব্য! আর সেইসব বীর টুপিধারী গোঁফ কামানো দাঁড়িতে মেহেন্দি মাখানো বহু বিবাহে তৃপ্ত বীরপুরুষদের অধিকার রক্ষা ছাড়া মুসলিম ল' বোর্ডের আর তো কোনো দায়িত্ব নেই! অবাঞ্ছিত-কথা না শোনা- বিবিদের তালাক দেওয়া সেতো খুন করার থেকে ভালো বটেই। ধন্য আমাদের দেশের দ্বিতীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের বেশরম বেরহম বেদরদ বদসলুক! এ অপরাধের ক্ষমা নেই। মুসলমান সমাজের তরুণ তরুণীরা নিশ্চয় এর জবাব দেবেন।

(লেখক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য)

সারা দেশের জন্য একই দেওয়ানি বিধি জরুরি

অমলেশ মিশ্র

ভারতের সংবিধান পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। এত সংখ্যক সাংবিধানিক ধারা ও তালিকা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের লিখিত সংবিধানে নেই। এত বৃহৎ হওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো— পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লিখিত সংবিধানগুলির থেকে ভালো ভালো অংশ চয়ন করে ভারতের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Directive Principles of State Policy শিরোনামে ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে যে নির্দেশাবলী উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি আয়ারল্যান্ডের সংবিধান থেকে সংগৃহীত। সে দেশের সংবিধানে Principles of Social Policy-র মতোই ভারতের Directive Principles of state Policy.

ভারতের সংবিধানের ৩৬ থেকে ৫১ ধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলিই দেশ পরিচালনের নির্দেশাবলী নামে পরিচিত। এই ধারাগুলির মধ্যে ৪৪ নং ধারাটি আমাদের আলোচ্য বিষয়। সংবিধানের ৪৪ নং ধারাটি এই রকম : The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. অর্থাৎ সারা দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য একইরকম দেওয়ানি বিধি প্রচলন করার চেষ্টা করবে রাষ্ট্র।

সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বাসু লিখেছেন— the object behind this article is to effect an intigratio of Indian by bringing all communities on the common platform on matters which are at present governed by diverse personal laws but which do not form the essence of any religion, eg, divorce, maintainance for divoced wife.

এই ধারার উদ্দেশ্য হলো ভারতের সমস্ত মানুষকে একই সাধারণ মঞ্চে নিয়ে আসা— বিবাহ-বিচ্ছেদ, বিবাহ বিচ্ছিন্নার ভরণপোষণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে, ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিভিন্ন পার্সোনাল ল' দ্বারা পরিচালিত হয়।

জর্ডন ডিয়েংডে বনাম এস. এস. চোপরা মামলায় (এ.আই.আর ১৯৮৫, এস. সি. ৯৩৫ পৃ. ৭ নং অনুচ্ছেদ) এবং মহম্মদ আমেদখান বনাম শাহবানো বেগম মামলায় (এ আই আর ১৯৮৫, এস সি ৯৪৫ পৃ. ৩২ নং অনুচ্ছেদ) এদেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়— সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছেন যে, সংবিধানের ৪৪ নং ধারা এতকাল একটি মৃতবৎ বিষয় হয়ে আছে। সরকারের এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা বিধেয়। (জর্ডন ডিয়েংডে মামলার রায়ের ৭নং অনুচ্ছেদ)

ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে যে নির্দেশাবলী আছে সেগুলিকে তিনটি আদর্শ ভিত্তিক ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) দেশের আদর্শ হিসাবে গ্রহণীয় ধারা— ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৭ এবং ৫১। (খ) দেশের নীতি হিসাবে গ্রহণীয় ধারা— ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮। এবং (গ) প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার হিসাবে গ্রহণীয় ধারা— ৩৯ (ক), ৩৯ (ঘ), ৩৯ (ঙ, চ), ৪১, ৪২।

আমরা দেখতে পাচ্ছি নির্দেশাবলীর (খ) ভাগে অর্থাৎ দেশের নীতি হিসাবে গ্রহণীয় ধারাগুলির মধ্যে ৪৪নং ধারা আছে। এই (খ) ভাগের ৪০ নং ধারা পঞ্চায়েতরাজ সম্পর্কিত। আমরা জানি যে এই ধারা মোতাবেক আইন প্রণীত হয়েছে এবং পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য নীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে ভারতরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিকতার ধারণা একটি রূপ পেয়েছে। এখন দেশের প্রত্যেক নাগরিক শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। এটি ভারতের অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গেও সুন্দর ভাবে সম্পর্কিত।

এই (খ) ভাগের ৪৮ ধারায় গোহত্যা নিষেধ করতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে এখনও কোনো আইন প্রণীত হয়নি। যে-কোনো সাধারণ বুদ্ধির মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার যে কেন এদেশে গোহত্যা নিষিদ্ধ হচ্ছে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার, ৪৮ ধারা রূপায়িত না হওয়া এবং ৪৪ নং ধারা রূপায়িত না হওয়ায় পিছনে একই কারণ বর্তমান এবং তা হলো বিগত ৬৯ বছর ধরে ভারতের শাসন ব্যবস্থা যারা পরিচালনা করেছেন তাদের মানসিকতা— যার অন্য নাম কাপুরুষতাও হতে পারে। তবে ওই ধারায় ক ও খ-তে বন ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির বিষয়ে প্রদত্ত নির্দেশ অনেকাংশে পালিত হচ্ছে।

কিন্তু ৪৪ নং ধারাটি অতিশয় মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এই ধারায় জাতীয় সংহতির বিষয়টি যুক্ত। অথচ এ বিষয়ে

কোনো আইন প্রণীত হচ্ছে না, যদিও অভিন্ন দেওয়ানি আইন (uniform civil code) এর দাবি বারবার উত্থাপিত হয়েছে এবং সর্বোচ্চ বিচারালয়ও সরকারকে এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। প্রসঙ্গত, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদীর একটি বক্তৃতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০১৬ সালের ৮ জুন আমেরিকার সেনেটের সদস্যদের সামনে তিনি তাঁর ভাষণে যা বলেছেন, তার একটি অংশ এই রকম : The constitution is our real Holy Book in which freedom of faith, speech, franchise and equality of all citizens are fundamental, অর্থাৎ সংবিধানই আমাদের প্রকৃত পবিত্রগ্রন্থ যেখানে বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ভোটদানের ও কথা বলার স্বাধীনতা সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার বলে গণ্য করা হয়েছে।

এই ভাষণে freedom of faith অর্থে ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ করতে হয় যে আমাদের সংবিধানের Preamble বা প্রস্তাবনাতেও বলা হয়েছে 'Liberty of thought, expression, belief, faith and worship.'

আমাদের কথা হলো— এগুলি সবই সার্থকরূপ পেয়েছে। কিন্তু সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে 'Equality of status and Oppertunity'-র কথা বলা হয়েছে তা আজও কার্যকরী না হয়ে কথার কথা হিসাবে থেকে গিয়েছে। Equality of status and oppertunity বলতে বোঝায় সমান অবস্থা ও সমান সুযোগ সকলের জন্য।

একই রকম দেওয়ানি বিধি না হওয়ায় মুসলমান মহিলারা ও অ-মুসলমান পুরুষরা সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিবাহ-বিচ্ছেদ ও বিবাহ বিচ্ছিন্নার ভরণপোষণ বিষয়ে মুসলমান মহিলারা অ-মুসলমান মহিলাদের মতো সমান সুযোগ পান না। তারা বঞ্চিত। অপরদিকে বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলমান পুরুষরা যত সংখ্যক বিবাহ করতে পারেন, অ-মুসলমান পুরুষরা ততসংখ্যক বিবাহ করতে পারেন না। অর্থাৎ সমান সুযোগ পান না। ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াল যে, বিবাহিত অ-মুসলমান মহিলারা বিবাহিত মুসলমান মহিলাদের সঙ্গে status ও oppertunity-তে equality পান না। আবার বিবাহিত অ-মুসলমান পুরুষরা বিবাহিত মুসলমান পুরুষদের থেকে পৃথক status ও oppertunity পেয়ে থাকেন অর্থাৎ সংবিধানে কথিত equality নেই। সংবিধানের প্রস্তাবনায় অনেক আড়ম্বর করে যে Equality বা সমানতার কথা বলা হয়েছে তা ৪৪ নং ধারা মোতাবেক আইনি ব্যবস্থায় রূপায়িত না হওয়ায়, কেবলমাত্র বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত।

এর থেকেও বড় কথা হলো— জাতীয় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে ৪৪ নং ধারার যে গুরুত্ব সংবিধানে উল্লিখিত তা পুরোপুরি পর্যুদস্ত। সরলা মুদগল বনাম ভারত সরকার মামলায় (এ আই আর ১৯৯৫, এস সি ১৫৩১ পৃ.) সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে বলেছেন একই রকম দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের কথা। জন ভাল্লামট্টম বনাম ভারত সরকার মামলায় (এ আই আর, এস সি ২০০২ পৃ.) সুপ্রিম কোর্ট আক্ষেপ করে বলেছেন, The Apx Court regrets that Art 44 has not been given effect to. Parliament is still to step in for framing a common civil code in the country which will help the cause of national integration by removing the contradiction based on ideologies. অর্থাৎ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় দুঃখের সঙ্গে বলছেন যে ৪৪ নং ধারাকে রূপায়িত করা হচ্ছে না। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সমস্ত রকম আদর্শ ভিত্তিক বিরোধকে দূর করে জাতীয় সংহতির কাজে সাহায্য করবে বলে আদালত মনে করছেন।

একথাও বারবার উঠেছে যে সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত নির্দেশাবলী (ধারা ৩৫-৫১), সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার (ধারা ১১-৩৫) গুলির মতো আইনগত মর্যাদা যুক্ত না হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়া যায় কিন্তু নির্দেশাবলী ক্ষুণ্ণ হলে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়া যায় না। কারণ নির্দেশাবলী Judiceable নয়। অর্থাৎ মামলা উত্থাপন করা যায় না বা আইনি প্রতিকার পাওয়া যায় না।

এই নির্দেশাবলীর ৩৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে এই নির্দেশাবলী পালিত না হলে কোনো প্রতিকার পাওয়া যাবে না, কোনো আদালত প্রতিকার দিতে পারবে না। ফলে এই ৪৪ নং ধারা কার্যকরী না করলেও সরকারের বিরুদ্ধে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে কোনো মামলা করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল সরকার মামলাটি (এ আই আর, এস সি ১৪৬১ পৃ.) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। সুপ্রিম কোর্টে এই মামলায় ১৩ জন বিচারপতির বেঞ্চ গঠন করে সাংবিধানিক বিষয়টি বিচার করা হয়েছিল। বিচারপতিরা ঐক্যমত্য হয়েছিলেন যে, এই নির্দেশাবলী (চতুর্থ অধ্যায়) সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির (তৃতীয় অধ্যায়) মতো আদালতের বিচারযোগ্য বিষয় না হলেও, এই নির্দেশাবলী ও এই মৌলিক অধিকারগুলি একই রথের দুইটি চাকার (two wheels of a chariot) মতো। নির্দেশাবলী হলো conscience of the constitution। নির্দেশাবলী ও মৌলিক অধিকারগুলি পরস্পরের পরিপূরক। এই দুইটি মিলেই core of the constitution।

৩৭ নং ধারায় আরও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এই নির্দেশাবলী পরিচালিকা শক্তি। রাষ্ট্রের কর্তব্য এই নির্দেশগুলিকে আইন প্রণয়নে প্রয়োগ করা।

''The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles there in laid down are nevertheless fundamental in governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws' [Att 37, Directive principles of state policy, Constitution of India].

অশোকা স্মোকলেস কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম ভারত সরকার মামলার রায়ের ১০৪ ও ১০৬ নং অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন যে এই নির্দেশাবলীর উপর

রাষ্ট্র যদি কোনো আইন প্রণয়ন করে তবে তা যুক্তিপূর্ণ কাজ বলে গৃহীত হবে।

উপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় ৪৪ নং ধারা অনুসারে সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা Uniform Civil Code তৈরি করতে পারে। কিন্তু আমরা দেখছি ক্ষমতা হস্তান্তরের (১৯৪৭) পর ৬৯ বছর অতিবাহিত হলেও, দেশের জাতীয় সংহতির স্বার্থে, 'Equality of Status and Oppertunity'র স্বার্থে এই ধরনের কোনো আইন প্রণীত হয়নি, যদিও তা করার সংবিধানগত ও আইনগত অধিকার সরকারের আছে।

প্রশ্ন উঠবে যদি পারে তবে করছে না কেন? করছে না, তার প্রধান কারণ, যে দলই সরকার গঠন করুক না কেন, দলীয় রাজনীতি ও ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠার শক্তি, সাহস ও মানসিকতা তাদের নেই। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার থেকে তারা নিজেদের ও দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বেশি আগ্রহী। এরা কেউই আব্রাহাম লিঙ্কনের মতো রাষ্ট্রপ্রধান নন। আজ থেকে ১৫০ বছর আগে, যখন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি অনেক পিছিয়ে ছিল, লিঙ্কন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতির কারণে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। বিগত ৬৯ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে তেমন কোনো সাহসী রাষ্ট্রপ্রধান— যিনি দেশকে দল ও নিজের ঊর্ধ্বে রাখতে পারেন, ভারতবর্ষে পাওয়া যায়নি। এই গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি ১৯৪৭ সালে নিতে পারলেই ভারত আজ উন্নতি ও মর্যাদার স্বর্ণ শিখরে যেতে পারত। কিন্তু সেই সময়কার রাষ্ট্রনেতৃত্ব ঝুঁকি নেননি। তাদের রাজধর্মের থেকে ব্যক্তি স্বার্থ অনেক বেশি বড় ছিল। বিগত ৬৯ বছরেও কেউ সেই ঝুঁকি নেওয়ার কথা কল্পনায় আনেননি। গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি না নিয়েও ১৯৪৭ সালে যে ধ্বংস ও রক্তক্ষয় হয়েছিল (১ কোটি ৪০ লক্ষ গৃহহীন, ১০ লক্ষের মৃত্যু) —ঝুঁকি নিলে এর থেকে বেশি নিশ্চয় হোত না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনার সঙ্গে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার তুলনামূলক আলোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা rootless এবং heartless শিকড় বিহীন, হৃদয়হীন। ভারতের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, ঐতিহ্য ও পরম্পরা, সহনশীলতা, বীরত্ব ও অহিংসা কোনো বিষয়েই প্রস্তাবনায় কোনো উল্লেখ নেই। ভারতবর্ষ যেন ১৯৪৭-এ জন্মগ্রহণ করেছে। এমনকী যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বিদেশিদের বিরুদ্ধে কয়েকশো বছর ধরে ভারতীয়রা করেছিলেন, প্রস্তাবনায় সে সব সম্পূর্ণ উহ্য ও অবহেলিত। ভারতবর্ষ কোনোকালেই বহুজাতিক দেশ ছিল না, আজও নয়। এদেশে বহুজাতি এসে বসবাস করেছেন ঠিকই, তার মানে এই নয় যে, এই দেশ বহুজাতিক দেশ, আমাদের জাতিটা হিন্দু। সম্প্রদায় নানারকম হতে পারে। অনেক সম্প্রদায় বসবাস করছে বলে দেশটা বহুজাতিক হয়ে যায় না, দেশটা হিন্দু জাতিরই থাকে। হিন্দু একটি জাতিবাচক শব্দ, কোনো সম্প্রদায় বাচক শব্দ নয়।

পাশ্চাত্যে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হয়েছে ধর্মান্ধতার প্রতিক্রিয়ায় আর ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো প্রতিক্রিয়া জাত নয়— সহজাত। রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকলেই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা পৃথকভাবে বলা হয়ে থাকে।

ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে যদি পার্সোনাল ল' বাধা না হয়, দেওয়ানি আইনের ক্ষেত্রে তা বাধা হওয়ার কথা নয়। যদি কেউ তা বাধা বলে মনে করে এবং পার্সোনাল ল'-এর উল্লেখ করে, বুঝতে হবে তা দুষ্টবুদ্ধি জাত। ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে ভারতের সংস্কৃতি ও সংহতি দুটিই বিপদগ্রস্ত।

সংবিধানের নির্দেশ মেনে ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা অভিন্ন দেওয়ানি আইন করা হোক। দেখা যাক, বাধা কোথা থেকে আসে। দেশের সংহতির স্বার্থে প্রয়োজনে গৃহযুদ্ধ করতে হলেও করতে হবে। মোদী সরকার ঝুঁকি নিতে পারেন, আব্রাহাম লিঙ্কন যেমন নিয়েছিলেন। ভারতের সংবিধানের রুটলেস এবং হার্টলেস, প্রস্তাবনা পড়লে মনে হয় না এদেশের একটি অতি প্রাচীন সংস্কৃতি আছে যা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীতে সর্বোন্নত ছিল। প্রস্তাবনা রুটলেস, কারণ প্রস্তাবনায় এদেশের শিকড়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রস্তাবনা হার্টলেস কারণ অতীতের কৃতিত্বের জন্য কোনো হৃদয়বত্তার প্রকাশ নেই।

Maria Wirth নামে একজন জার্মান ভারতবিদ বলেছেন যে ৫৯ শতাংশ খ্রিস্টান অধিবাসী নিয়ে জার্মানি নিজেকে খ্রিস্টান দেশ ঘোষণা করেছে। অথচ ৮০ শতাংশ হিন্দু নিয়েও ভারত নিজেকে হিন্দুদেশ ঘোষণা করতে পারেনি। তিনি হয়তো সুকৌশলে ভারতীয় রাজনীতিকদের কাপুরুষ বলতে চেয়েছেন।

ভারত পারেনি, কারণ শতবর্ষ আগে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নামে ভারতের সর্বাপেক্ষা কর্তৃত্বশালী নেতা যে তুষ্টিকরণ রাজনীতির জন্ম দিয়েছিলেন এবং ৬০ বছর যাকে লালন পালন করেছিলেন— যে তুষ্টিকরণ রাজনীতির শতবর্ষপূর্তি উৎসব চলছে। সেই তুষ্টিকরণ রাজনীতির শিকড় অনেক গভীরে চলে গেছে। কেউই তা উৎপাটন করতে বা ছেদন করার ঝুঁকি নিচ্ছেন না। আরও মর্মান্তিক বিষয় হলো সেই বিষবৃক্ষের প্রশ্রয়ে ক্ষমতা ভোগ করছেন।

১৯৭৬ সালে হঠাৎ করে সংবিধান সংশোধন করে প্রস্তাবনায় সেকুলার শব্দটি ঢোকানো হলো। ভারতবর্ষে 'সেকুলার' বিষয়টা সহজাত। সেই দেশকে নতুন করে সেকুলার বলাকে বলা যায়— Falacy of Petitio Principt. এই যে ভোটকেন্দ্রিক ধর্মনিরপেক্ষতা এটি ১০০ ভাগ ভারতীয় ব্র্যান্ড অর্থাৎ ভারতমার্কা।

সংবিধানের ৪৪ ধারা মূলত জাতীয় সংহতির স্বার্থেই আইনে পরিণত হওয়া প্রয়োজন। এতে কেউই বাধা দেবেন বলে মনে হয় না। যদি কেউ বাধা দেন, ধরে নিতে হবে তিনি জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে, ভারতের সংবিধানের Equal Status and Oppertunity নীতির বিরুদ্ধে। বাধাদানকারীদের সহজেই চিহ্নিত করা যাবে। স্বচ্ছ ভারত তৈরি করার যে আহ্বান নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত ভারত সরকার দিয়েছেন, সংবিধানের ৪৪ ধারাকে কার্যকরী আইন রূপে রূপায়িত করাও সেই স্বচ্ছ ভারত তৈরির একটি পদক্ষেপ। ■

চিঠিপত্র

হিন্দু, হিন্দুত্ব ও হিন্দুধর্ম

অধ্যাপক আশিস রায় তাঁর নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ৪.৭.১৬) প্রসঙ্গত বলেছেন— ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মতে, 'Hindutva is a way of life, it is a way of thinking.' অনেকেই সুপ্রিম কোর্টের উক্ত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে থাকেন; কিন্তু কখন, কীসের ভিত্তিতে ওই সিদ্ধান্ত তা তাঁদের লেখায় পাওয়া যায় না। ফলে, উদ্ধৃতির যথার্থতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। বস্তুত বলা যায়, প্রত্যেক ধর্মমতই এক ধরনের 'a way of life, a way of thinking'। যেমন, ইসলাম। ১৯৭৬ সালের এপ্রিলে লন্ডনে অনুষ্ঠিত International Islamic Conference-এ মৌলানা সৈয়দ আবুল আলা মৌদুদি (১৯০৩-৭১) তাঁর 'The Message of Islam' শীর্ষক ভাষণে বলেছেন— ''...He (the prophet) bring with him a whole system of thought and action which is called Al-Deen (a complete way of life) in Islamic Terminology।''

১৯৫০ সালে সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চ একটি মামলার রায়ে বলেছেন— ''সংবিধানে 'ধর্ম' কথাটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। কিন্তু যে কোনো ধর্মের ভিত্তিতে থাকবে বিশ্বাস। আরও থাকবে নৈতিকতার নিয়ম, উপাসনা, অনুষ্ঠান, উৎসব, পূজা-পদ্ধতি। এমনকী খাদ্য ও পোশাকের বেলায়ও পালনীয় নির্দেশ থাকতে পারে।'' ১৯৯৫ সালের জুলাইয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে চার দশক আগেকার ওই রায়ের উল্লেখ ছিল। সংশ্লিষ্ট মামলাটির বিচার্য বিষয় ছিল— 'রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু প্রতিষ্ঠান না অহিন্দু প্রতিষ্ঠান।' মামলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে সময় লেগেছিল ১৫ বৎসর (১৮.২.১৯৮০—২.৭.১৯৯৫)।

আশিসবাবু বলেছেন— 'হিন্দু' কোনো বিশেষ ধর্ম নয়। গীতা, উপনিষদ, চণ্ডীতে 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নেই। তা থাকার তো কথাও নয়; কারণ, 'হিন্দু' শব্দটি অর্বাচীন। স্বামী বিবেকানন্দ জানিয়েছেন— ''বেদে সিন্ধু নদের 'সিন্ধু', 'ইন্দু' দুই নামই পাওয়া যায়; ইরানিরা তাকে 'হিন্দু', গ্রিকরা 'ইন্ডুস' করে তুললে; তাই থেকে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্মের অভ্যুদয়ে 'হিন্দু' দাঁড়ালো— কালা (খারাপ), যেমন এখন নেটিভ'— ('পরিব্রাজক'-বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড)। বিবেকানন্দ বলেছেন--- ''প্রাচীন পারসীকদের বিকৃত উচ্চারণে 'সিন্ধু' শব্দই 'হিন্দু' রূপে পরিণত হয়; তাঁহারা সিন্ধুনদের অপরতীর-বাসী সকলকেই হিন্দু বলিতেন। এইরূপে 'হিন্দু' শব্দ আমাদের নিকট আসিয়াছে''— ('জাফনায় বক্তৃতা'-ঐ, ৫ম খণ্ড)। অর্থাৎ 'হিন্দু' নামে, বিশেষ- অবিশেষ কোনো ধর্ম নেই কোনো কালেই ছিল না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল— ''Hinduism is a way of life and a state of mind, not a religion''।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

আনন্দমার্গীদের নৃশংস হত্যা?

১৯৮২ সালে ৩০ এপ্রিল বিজন সেতুর উপর ১৭ জন আন্দমার্গীকে নৃশংস ভাবে গায়ে পেট্রল ঢেলে হত্যা করে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনের প্রচারে দোষীদের শাস্তি দেবেন বলেছিলেন অথচ অদ্যাবধি কিছু করলেন না। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো ব্যবস্থা করতে বদ্ধপরিকর হোন। তাহলে জনগণ যথেষ্ট সুবিচারের আশা রাখবেন বর্তমান সরকারের কাছে। আশা করি আমাদের আবেদনে সাড়া পাব।

—**শিউলি রায়,**
তারাসুন্দরী দাস, তারাপীঠ, বীরভূম।

পৌরাণিক চরিত্র

২৯ আগস্ট ২০১৬ স্বস্তিকা পত্রিকায় প্রকাশিত কমলাকান্ত বণিকের রচিত শ্রীকৃষ্ণ প্রবন্ধটির অনেকাংশই ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির বিরোধী। মুখ্যত আধ্যাত্মিক বিষয়ে অভিজ্ঞতাহীন দেশদ্রোহী সেকুলার ঐতিহাসিকরা আমাদের পূজনীয় পৌরাণিক চরিত্রগুলি নিয়ে যা যা ভুল তথ্য প্রচার করে থাকে সেই জাতীয় বাক্যে এই প্রবন্ধটি পরিপূর্ণ। কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তি সত্যই জন্মগ্রহণ করার পর প্রচুর সেবামূলক তথা অলৌকিকতার স্বাক্ষর প্রদান করার পরই সমাজে তাদের নিয়ে সম্প্রদায় সৃষ্টি হয় ও পূজা প্রচলিত হয়। শংকরাচার্য, বুদ্ধ, জৈন, শ্রীচৈতন্য— এঁরা বাস্তবে ছিলেন বলেই এঁদের উপাসক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপ ভাবে শ্রীরাধিকা জন্মেছিলেন বলেই তাঁরও উপাসক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। বর্ষাণা ও রাভেলগাঁও স্থানে রাধামায়ের জন্মভিটে আজও সযত্নে রাখা আছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের মতোই। তাহলে রাধাকে পুরাণ স্রষ্টাদের নির্মিত কাল্পনিক রূপক চরিত্র বলা যায় কেমন করে? কৃষ্ণের উপরেও পরে দেবত্ব আরোপ হয়নি। এছাড়া ৫ সেপ্টেম্বরের স্বস্তিকার চিঠিপত্র বিভাগে আমার রচনার বিরুদ্ধে বিমলেন্দু ঘোষ যে পত্র লিখেছেন তার জবাবে জানাই যে নাস্তিকদেরও আমি আলাদা সম্প্রদায়ভুক্ত করেছি। ইসলাম খ্রিস্টানের সঙ্গে তাদের গুলিয়ে ফেলিনি।

—**রবীন সেনগুপ্ত,**
বহরমপুর।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

নাগরিকত্ব বিল ও মমতার বিরোধিতা

কমল মুখার্জী

আমরা কথায় কথায় দোষ দিই নেহরু, গান্ধীজী, কমিউনিস্ট ও অন্য নেতাদের ভারত বিভাগের জন্য। পঞ্জাবে যে লোকবিনিময় হলো তা বাংলায় না হওয়ার জন্য শরৎ বোস, কিরণশঙ্কর রায় ও নেহরুকে দোষ দেওয়া হয়। তারপর ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু এবং অ-মুসলমানদের উপর যখন অকথ্য অত্যাচার চলছে তখন আবার লোকবিনিময়ের কথা ওঠায় নেহরু-লিয়াকত চুক্তি করে পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুদের হায়নার মুখে ঠেলে দিয়েছিল বলে নেহরুকে গালাগালি দিই। এই চুক্তির ফলে এদেশ থেকে চলে যাওয়া মুসলমানরা আবার বহুলাংশে এদেশে ফিরে আসেন। কিন্তু হিন্দুরা ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করে আর পাকিস্তানে ফিরে যাননি। এমনকী পাকিস্তানের মন্ত্রী যোগেন মণ্ডল যিনি দেশ বিভাগের সময় মুসলমান- তপশিল এক হয়ে বর্ণহিন্দুদের বিতাড়নের পক্ষে জোরদার আন্দোলন করেছিলেন, তিনিও পাকিস্তান থেকে ধন প্রাণ মান নারীদের সম্ভ্রম নিয়ে তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। তারপর মাঝে মাঝেই অত্যাচারের ফলে হিন্দুরা চলে আসতে বাধ্য হন। সেই ট্রাডিশন যে এখনো চলছে তাঁর দৃষ্টান্ত সম্প্রতি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধানের প্রাণভয়ে ভারতে চলে আসা। হিন্দুদের এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে জনসঙ্ঘ দল প্রতিষ্ঠা করেন। জনসঙ্ঘ প্রথম থেকেই হিন্দু

উদ্বাস্তুদের জন্য লড়াই করে গেছে, পরবর্তীকালে বিজেপি অত্যাচারিত হিন্দু উদ্বাস্তুদের শরণার্থী নাম দিয়ে তাদের এদেশে আসার অনুমতি ও নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা প্রথম থেকে বলে এসেছে। নরেন্দ্র মোদী ২০১৪-র নির্বাচনী প্রচারে এসেও হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এখন তিনি তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। তার বিরোধিতা কে করছে? এই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু নেতারা, আরো বিশেষ করে বলতে হলে যিনি ধর্মনিরপেক্ষ সাজার জন্য তাঁর পিতৃদত্ত পদবিও তুলে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। কংগ্রেস সিপিএম অন্যান্য সেকু-মাকুদের দল তো আছেই, তাদের কথা বাদ দিলাম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সমস্যাটির উৎপত্তি হলো কেন? পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু নেতারা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ইতিহাস পড়তেন বা ক্ষমতার কথা একটু কম চিন্তা করে নিজেদের অস্তিত্বের কথা বলতেন তা হলে আখেরে লাভ হোত। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ১৯৩৯ সালে মুসলিম লীগ ঘোষণা করল যে ইসলাম শুধু একটা আলাদা ধর্ম নয়, মুসলমানরা আলাদা জাতিও। তারা হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে পারবে না তাদের জন্য আলাদা বাসভূমি চাই। কমিউনিস্ট পার্টি যারা প্রথম থেকেই দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত, তারা বলল— এটা ঠিক, মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি, তাদের জন্য আলাদা রাজ্য চাই। সমগ্র বাংলাই পাকিস্তানে চলে যাচ্ছিল। ড. শ্যামাপ্রসাদের আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ আলাদা হিন্দুভূমি হিসাবে ভারতে যুক্ত হলো। স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুদের তথা অ-মুসলমানদের। এখানে মুসলমানদের কোনো স্থান নেই। কিন্তু হিন্দুধর্মের উদারতা বা ধর্মনিরপেক্ষতার ফলে মুসলমানদের এদেশে থাকতে দেওয়া হলো। শুধু নেহরু-গান্ধীদের দোষ দিয়ে কী লাভ। এই সমস্ত হিন্দু বিদ্বেষী নেতা নিজেদের গদির লোভে প্রথম থেকেই মুসলমানদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ফেলে গেছেন, যার ফল আজকের সেকু-মাকুর দল অর্থাৎ কংগ্রেস-কমিউনিস্ট, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকদলের নগ্ন মুসলমান প্রীতি অবিভক্ত বাংলার সুরাবর্দীকেও ছাপিয়ে গেছে। আজকে নাগরিকত্ব বিলে মুসলমানদের আসার পথ সহজ করে পশ্চিমবঙ্গকে আরো একটা ইসলামিক দেশ বানাতে প্রত্যক্ষ সাহায্য করা হচ্ছে। তাই সমস্ত সেকু-মাকুর হিন্দু নেতাদের যোগেন মণ্ডলের জীবনীটা একটু পড়তে বলছি বা তার অভিজ্ঞতা একটু স্মরণ করতে বলছি।

অসমিয়ারা এই এক-ই ভুলের জন্য সিলেট হারিয়েছেন। অসম আজ টুকরো টুকরো হয়ে মিজোরাম নাগাল্যান্ড মণিপুর-সহ সাত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এরকম করলে আরো টুকরো হয়ে যাবে, বোরোল্যান্ড, বাংলাল্যান্ড হয়ে যাবে। ইসলামি মৌলবাদীরা সমগ্র উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে ইসলামিস্থান বানাতে সচেষ্ট। তখন আর কিছু করার থাকবে না। সুতরাং সাধু সাবধান!

সংকীর্তনে মৃদঙ্গ ও করতাল

শ্রীদেবপ্রসাদ মজুমদার

বর্তমানে গান গাইবার সময়, তা দেশি বা বিদেশি যে ধরনের সঙ্গীত হোক না কেন, গায়কেরা বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করে থাকেন। এর ফলে অনেক সময় আমরা গায়কের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ঠিক মতো উপলব্ধি করতে পারি না। কিন্তু এই বিষয়ে বোধ করি ব্যতিক্রমী উদাহরণ বৈষ্ণব ভগবদ্ সংকীর্তন। কারণ দেখা যায় কেবলমাত্র মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে বৈষ্ণব গায়ক তাঁদের ভগবদ্ সংকীর্তন বা কীর্তনাদি করে থাকেন। সেই সংকীর্তন অনেকের কাছে শ্রুতিমধুর না হলেও ভক্ত ও বৈষ্ণবদিগের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক, শ্রুতিমধুর ও উদ্দীপনাময় হয়ে থাকে সন্দেহ নেই। অতি প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি বৈষ্ণবগণ মৃদঙ্গ ও করতাল সমন্বয়ে সংকীর্তন করে থাকেন।

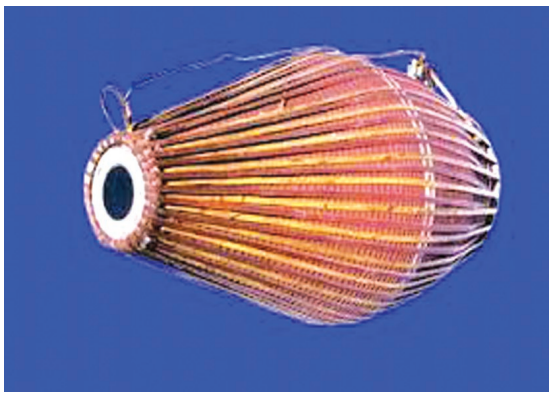

এখন প্রশ্ন জাগে, কখন বা কবে থেকে বৈষ্ণবগণ বা বৈষ্ণব গায়কগণ এই মৃদঙ্গ ও করতাল সমন্বয়ে সঙ্গীত সাধনা শুরু করেছিলেন। বিষয়টি অবশ্যই বিতর্কিত ও গবেষণার। কিন্তু এটি যে 'শ্রীবৈষ্ণব' সম্প্রদায়ের অন্যতম আদিগুরু শ্রীশ্রীনাথ মুনির সময় বা তার পূর্বকাল থেকে শুরু হয়েছিল তা অনায়াসে বলা যায়। কারণ আমরা জানি যে শ্রীনাথমুনি দিব্যসঙ্গীতে দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন এবং শ্রী শতকোপ আঝবারের সমগ্র দিব্য প্রবন্ধাবলী সুর তাল লয়ে সঙ্গীতের রূপ দিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ এবং তিনি দিব্য সঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক। এই দিব্য সঙ্গীত তাঁর ভগবৎ সেবার এক প্রধান অংশ ছিল। তাঁর যে সকল প্রতিমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে প্রত্যেকটি চিত্রপটেই তাঁর দুটি হাতে দুটি করতাল আমরা দেখতে পাই। এতে ধারণা স্পষ্ট হয় যে, তিনি করতাল সহযোগে দিব্য সঙ্গীত আরাধনা করতেন ও গাইতেন।, তাঁরই অনুকরণে পরবর্তীকালে শ্রীবৈষ্ণবগণের মধ্যে মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে সংকীর্তন সাধন করা হয়ে থাকে এবং এটি ভগবদ্ আরাধনার একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে অদ্যাবধি প্রচলিত। করতাল ও শ্রীনাথমুনি সম্বন্ধে এক অলৌকিক কাহিনি আছে, যার উল্লেখ বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীনাথমুনির সময় দু'জন বিখ্যাত গায়িকা চোল রাজার রাজসভায় গান গাইবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। নির্দিষ্ট দিনে ওই দুই গায়িকার মধ্যে একজন মানব-সঙ্গীত ও অপরজন দেব-সঙ্গীত গাইলেন। চোলরাজ, তাঁর পারিষদবর্গ ও রাজার সঙ্গীতজ্ঞগণ মানব-সঙ্গীতের প্রশংসা ও মানব-সঙ্গীতকে অধিক মর্যাদা দান করলেন। এতে দেবসঙ্গীত গায়িকা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবলেন যে এই রাজা ও তাঁর সভার লোকেরা দেবসঙ্গীত উপলব্ধি করবার উপযুক্ত পাত্র নন। তারপর তিনি ক্ষুণ্ণ মনে রাজসভা ত্যাগ করে দক্ষিণ ভারতের দেবমন্দির সমূহে গিয়ে দেবতার সম্মুখে দেবসঙ্গীত গাইতে লাগলেন। এইভাবে কিছুকাল অতিক্রান্ত হলো। একদিন ওই গায়িকা শ্রীনাথমুনির দেবমন্দিরে শ্রীমন্নানারায়ণ অর্চা বিগ্রহের সামনে তাঁর দেব সঙ্গীত গাইতে লাগলেন। শ্রীনাথমুনি ওই গায়িকার দেব সঙ্গীতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়ে গায়িকাকে বহু সম্মান প্রদান করলেন। আর তাঁর গান যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত তাও ঘোষণা করলেন।

এর অব্যবহিত পরে ওই গায়িকা চোল রাজসভায় পুনরায় গিয়ে রাজা ও তাঁর পারিষদদের জানালেন যে তাঁর দিব্য সঙ্গীতের মর্যাদা বোঝার জন্য অন্তত একজনকে তিনি পেয়েছেন, আর তিনি হলেন বীরনারায়ণ পুরের শ্রীশ্রীমন্নানারায়ণদেবের পূজারি শ্রীনাথমুনিস্বামী। ওই সময় শ্রেষ্ঠ দেবসঙ্গীত গায়ক হিসাবে শ্রীনাথমুনি বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং তিনি যে সাধনায় সিদ্ধ একজন মহাপুরুষ ছিলেন, ওই রাজা ও তাঁর পারিষদদের অজানা ছিল না। এরপর রাজা শ্রীনাথমুনির দিব্যসঙ্গীত শ্রবণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে, রাজাদেশে রাজমন্ত্রী শ্রীনাথমুনিকে রাজদরবারে এসে সঙ্গীত পরিবেশন করবার জন্য প্রার্থনা করলেন। শ্রীনাথমুনি তাঁকে আমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য কী তা জানতে চাইলেন। তখন চোলরাজ অত্যন্ত বিনীতভাবে শ্রীনাথমুনির কাছে দিব্যসঙ্গীত শোনবার জন্য প্রার্থনা করলেন। শ্রীনাথমুনি বললেন যে সাধারণে মানব সঙ্গীত উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু দেবসঙ্গীত উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু মানব সঙ্গীত যেমন মানুষের মনকে দ্রবীভূত করতে পারে তেমনি দেবসঙ্গীত জড় বস্তুকে সচল এবং শিলাকে দ্রবীভূত করতে সক্ষম। এরপর তিনি রাজসভায় এক পাথরের স্তম্ভের কাছে একজোড়া করতাল রেখে দিতে বললেন। তৎক্ষণাৎ ওই আদেশ পালন করা হলো। এবার শ্রীনাথমুনি তাঁর দিব্য সঙ্গীত শুরু করলেন। রাজা ও পারিষদগণ ওই সুমধুর দিব্য সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হলেন। গানের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে প্রাসাদের ওই স্তম্ভ দ্রবীভূত হতে শুরু করেছে এবং ওই করতাল দুটি স্তম্ভের পাথরে আটকে গেছে। এরপর আবার সঙ্গীত শুরু হলো, ওই পাথরের স্তম্ভ আবার পূর্বের মতো হলো এবং করতাল দুটিও স্তম্ভ থেকে খুলে গেল। রাজা রাজসিংহাসন থেকে নেমে শ্রীনাথমুনির চরণে পতিত হয়ে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। এরপর শ্রীনাথমুনি রাজাকে আশীর্বাদ করে নিজের মন্দিরে ফিরে এলেন।

যথার্থ গৃহ

অমিত ঘোষ দস্তিদার

শাস্ত্রে বলা হয়, 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'— গৃহিণীযুক্ত গৃহকেই যথার্থ গৃহ বলা হয়। আচার্য শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ সেই গৃহিণীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন— 'তোমরা গৃহিণী, সর্বনিয়ন্তা তোমাদের উপর কতবড় সাংসারিক দায়িত্ব চাপাইয়াছেন। গৃহিণীরূপে তোমাদিগকে স্বামীসেবা, পুত্রকন্যার প্রতিপালন, অতিথি সৎকার, দেবসেবা কতকিছু করিতে হয়। তাহারই ভিতর যতটা অবসর পাও ধ্যান-জপ করিবে। তাহাতেই যথেষ্ট কাজ হইবে। একবার মনকে স্ববশে আনিতে পারিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে' (শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ শতরূপে শতমুখে, ১ম খণ্ড, ৪০২ পৃ.)।

সংস্কৃতি ও দিব্যব্রহ্মজ্ঞানের উৎসভূমি হলো অতুলনীয় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। সনাতন আদর্শ ও সংস্কৃতির বৈভবে নারীজাতিকে সম্মানের সঙ্গে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বসভায় আজও গৌরবান্বিত আমাদের ভারতবর্ষ।

পাতিব্রত্যে, আত্মত্যাগে ও ধৈর্যে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সংযুক্তা, পদ্মিনী; ব্রহ্মবিদ্যায় মৈত্রেয়ী, গার্গী; গণিতশাস্ত্রে লীলাবতী, জ্যোতির্বিদ্যায় খনা; ভগবদ্ভক্তিতে ও গীতরচনায় মীরাবাঈ; বীরত্ব ও তেজস্বিতায় দুর্গাবতী ও লক্ষ্মীবাঈ; ধর্মকথা ও দানশীলতায় রানি অহল্যাবাঈ, রানিভবানী ও রানি রাসমণি— এই মহান নারীদের ঐতিহ্য স্মরণ করেই বাঙালি কবি অতুলপ্রসাদ লিখেছিলেন—

"বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র প্রসূতি
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।"

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ অতৌ হি ত্রিষুলোকেষু নাস্তি মাতৃসম গুরু"— অর্থাৎ মা যে গর্ভধারণ ও সন্তানকে লালন-পালন করে তাকে বড় করে তোলেন, সেজন্য তিনলোকে মায়ের সমান গুরু নেই।

হিন্দুর গার্হস্থ্যাশ্রমের মূল মন্ত্র হলো ত্যাগ, সংযম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা ও বিশ্বাস সাংসারিক তথা সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। আজকের দিনে দেশ এবং সমাজের অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মূল কারণ হলো নৈতিকতার চরম অবনতি। পবিত্র ধর্মবোধের উপরই নৈতিকতা, সততা বিরাজ করে। এর অভাবেই আজ সমাজ দুর্নীতিগ্রস্ত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— যতদিন দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সঙ্গে আত্মা পাশাপাশি থাকে বা তারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে, ততদিন আত্মা অবস্তু হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞানীদের কাছে বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়। শোক, দুঃখ, আনন্দ, ভয়, রাগ, লোভ, মোহ, আকাঙ্ক্ষা, জন্ম-মৃত্যু— সবকিছুই অহঙ্কার থেকে উদ্ভূত হয়। ভিত্তিহীন বা অমূলক অহঙ্কারই মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণশক্তি, ভূতময় দেহ রচনা করে।

অসংখ্য সংসার জুড়ে হয় সমাজ, কারণ সংসার হচ্ছে বৃহত্তর সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশ। এই প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশকে একমাত্র সুগঠিত করতে পারে নারী, একথা যে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে অবশ্যই বুঝতে হবে। নারীর দায়িত্ববোধ যদি সংসার-জীবনের ক্ষেত্রে সঠিক অনুপ্রেরণা দিতে পারে তবে সমাজও সুগঠিত হবে এবং সেই সমাজ জাতির কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হবে। হিন্দুজাতির পুনরুত্থান ও পুনর্গঠনের জন্য আজ পিতা-মাতাকে আদর্শ সংসার গড়ার শপথ নিতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে নারীর দায় সর্বাগ্রে বর্তায়। কারণ শিশু জন্ম নিয়েই সর্বপ্রথম মায়ের সঙ্গে আলাপচারিতা করে এবং জীবনের প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে থেকেই পায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা ও বিশ্বাস সাংসারিক তথা সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আজ একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমান দিনে গার্হস্থ্যজীবনকে সুখময় করে তোলার জন্য নারীদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। প্রাচীন ভারতের আর্যঋষি-নির্দিষ্ট চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্যাশ্রমই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তাই সেই কথা মাথায় রেখে আজও নারীদেরই একমাত্র অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে, তবেই গড়ে উঠবে আদর্শ গৃহ। আর আদর্শ গৃহ গড়ে উঠলে সমাজও হয়ে উঠবে আদর্শময়, তখন বিচ্ছিন্ন অবস্থা দূর হয়ে গড়ে উঠবে এক মহান সঙ্ঘশক্তিময় অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র।

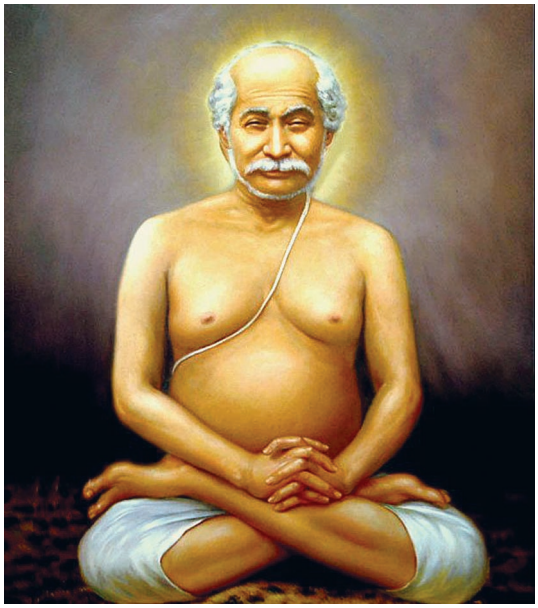

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী

রূপশ্রী দত্ত

যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮২৮-২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) 'লাহিড়ী মহাশয়' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি মহাবতার বাবাজির কাছে ক্রিয়াযোগ শিক্ষা করেছিলেন। তিনি সংসারের সদস্যদের সঙ্গেই থাকতেন।

কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণিগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গৌরমোহন লাহিড়ী, মাতা মুক্তকেশী। তিনি সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। শিশুকালেই তিনি মাকে হারিয়েছিলেন। তাঁর মা শিবভক্ত ছিলেন। তিন-চার বছর বয়স থেকেই তাঁকে ধ্যান করতে দেখা যেত। পূর্বপুরুষের বাড়ি বন্যায় ভেসে যাওয়ায়, তিনি বারাণসীতেই আজীবন বাস করেছেন। শিশুকালে তিনি উর্দু, হিন্দি— পরবর্তীতে বাংলা, সংস্কৃত, ফরাসি শিখেছিলেন। সরকারি সংস্কৃত কলেজে তিনি সংস্কৃত শিখেছিলেন। বেদপাঠ, গঙ্গাস্নান ও পূজা— তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। ১৮৪৬ সালে কাশীমণি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর দুই পুত্রের নাম দুকড়ি ও তিনকড়ি। তিনটি কন্যার নাম হরিকামিনী, হরিমোহিনী ও হরিমতী। তাঁর স্ত্রী তাঁর শিষ্যা হয়েছিলেন। সকলের নিকট তিনি 'গুরু মা' নামে পরিচিত ছিলেন। দুই পুত্রও সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

যোগীরাজ, কর্মসূত্রে রানিক্ষেতে বদলি হয়েছিলেন। একদিন পাহাড়ের কাছাকাছি পদচারণার সময়, তিনি শুনেছিলেন— কেউ তাঁর নাম ধরে ডাকছেন। কিছুটা উঁচুতে উঠে তিনি তাঁর গুরু মহাবতার বাবাজীকে দেখেছিলেন। তিনি, যোগীরাজকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা দিয়েছিলেন। একাধারে চাকুরি ও সংসার-প্রতিপালন আবার অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াযোগের শিক্ষক ছিলেন।

১৮৮৬ সালে, তিনি পেনশন-সহ চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে প্রচুর দর্শনার্থী সমাগম হোত। তিনি অর্ধ-সমাধিতেও বিভোর থাকতেন। হিন্দু, মুসলমান , খ্রিস্টান— ক্রিয়াযোগে সকলেরই প্রবেশাধিকার ছিল। যে-কোনো শ্রেণীর যে-কোনো ধর্মের ব্যক্তি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারতেন। তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যদের মধ্যে পঞ্চানন ভট্টাচার্য, যুক্তেশ্বর গিরি, প্রণবানন্দ, বালানন্দ ব্রহ্মচারী অন্যতম। গীতার নির্বাচিত অংশ হিন্দি ও সংস্কৃতে অনুবাদ করে তিনি বিতরণ করতেন। ১৮৯৫ সালে, ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি ভক্তদের ডেকে বলেছিলেন— 'আমি স্বগৃহে যাচ্ছি। আবার আসব।'

তিনি বলেছিলেন, সৎভাবে জীবনযাপনই মূল কথা। প্রাণায়াম, সত্যের অভিজ্ঞতা দ্বারা সৃষ্ট ক্রিয়াযোগই ধর্মের মূল কথা। উপদেশের থেকেও তার মাহাত্ম্য অধিকতর। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

কালু তান্ত্রিকের পর্দা ফাঁস

এক মহাবিদ্যা শিখেছে ডোমপাড়ার কালু তান্ত্রিক। সকাল বিকেল কত লোকের ভিড় তাকে

দেখার জন্য। অনেকে আবার তার কাছে নানা সমস্যার সমাধানও পেয়ে যাচ্ছে। কারো বাড়িতে শান্তি নেই, কারো ছেলের অসুখ সারছে না ইত্যাদি। কালু তান্ত্রিক তাদের নানা উপায় বাতলে দিচ্ছে। জলপড়া, ফুল ও বেলপাতা ভরা তাবিজ ধরিয়ে দিচ্ছে হাতে। তাতে অনেকের নাকি কাজও হচ্ছে। কিন্তু আসল বিষয়টি অন্য। সে নাকি ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ করে পুজোতে বসে। আর পুজো শেষ করে ঠাকুরঘরের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকে। অনেকে বলছে তান্ত্রিক নাকি ঠাকুরঘরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কালু তান্ত্রিকের এই মহাবিদ্যার কথা এখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দূর দূর গ্রাম থেকে লোক আসছে তাকে দেখার জন্য। গ্রামের লোকেরাও বেশ সমীহ করতে শুরু করেছে। এরকম একজন মানুষ গ্রামে থাকা চাট্টিখানি কথা নয়।

গ্রামের মাস্টারমশাই হারানবাবুর ছেলে ভুতোর কিন্তু এই ব্যাপারটাতে খটকা লেগেছে। ওই কালু তান্ত্রিক যে কিনা সারাদিন গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকে সে আবার এমন মহাবিদ্যা শিখেছে! ব্যাপারটা একটু ভালো করে দেখতে হবে।

ভুতো একদিন তার তিন বন্ধুকে নিয়ে সকাল সকাল হাজির কালু তান্ত্রিকের বাড়িতে। তখনও পুজো আরম্ভ হয়নি। অনেক লোক ইতিমধ্যে এসে গেছে। চট পেতে তাদের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভুতোরা একেবারে সামনে গিয়ে বসল। একটু বাদেই পুজো আরম্ভ হবে। লাল কাপড় পরে কালু তান্ত্রিক এসে পুজোয় বসল। ধূপ ধুনো কত উপাচার। ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি। একটু পরে ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ হলো। লোকেরা সব অধীর আগ্রহে বসে আছে। খানিক বাদে তান্ত্রিক সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকলো। শুরু হলো জলপড়া, ফুল-বেলপাতা, তাবিজ বিতরণ।

কালু তান্ত্রিকের এই অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটাতে যে কোনো গণ্ডগোল আছে ভুতো তা একেবারে নিশ্চিত। সেদিন সন্ধ্যে হতেই ভুতো চুপি চুপি তান্ত্রিকের ঠাকুর ঘরের পিছনে এসে দাঁড়ালো। তখন সাড়ম্বরে মন্দিরে পুজো হচ্ছে। ভুতো দেখলো ঠাকুরঘরের ঠিক পিছনেই কুলগাছের কাছে কিছু একটা বস্তা দিয়ে ঢাকা দেওয়া। ভুতো কাছে গিয়ে সেই ঢাকা খুললো। একি! এতো এক বিশাল গর্ত। ভুতো গর্তটা ভালো করে দেখল। এবার ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

পরেরদিন পুজো আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগে ভুতোরা এসে হাজির। আজ ক্লাবের কয়েকজনকেও ডেকে এনেছে তারা। ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ হতেই ওরা সবাই মিলে সেই গর্তের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। একটু বাদেই ঢাকা সরিয়ে কালু তান্ত্রিক উঠে এলো। আর যেমনি বেরিয়েছে অমনি সবাই মিলে তাকে ঘাড়ে ধরল। বেচারা কালু তান্ত্রিক কী করবে ভেবে না পেয়ে দিলো দৌড়। গ্রাম ছেড়ে মাঠ নদী পেরিয়ে সেই যে পালাল তারপর আর বহুদিন গ্রামে ফেরেনি।

বিরাজ নারায়ণ রায়

ভারতের পথে পথে

কালাডি

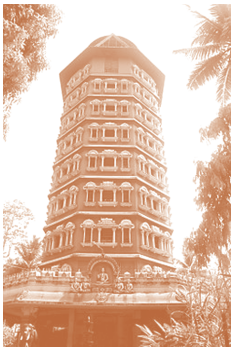

আদি শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান। কেরল রাজ্যের এর্নাকুলাম জেলায় পেরিয়ার নদীর তীরে অবস্থিত। কথিত আছে, আগে পেরিয়ার নদী দূরে প্রবাহিত হতো। শঙ্করাচার্যের মা একদিন স্নান করতে যাওয়ার পথে প্রখর রোদে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বালক শঙ্করের আকুল প্রার্থনায় পেরিয়ার নদী তাঁদের বাড়ির পাশে চলে আসে। আজও সেখানে বালক শঙ্করাচার্যের পদচিহ্ন রয়েছে। কালাডিতে রয়েছে আদি শঙ্কর কীর্তিস্তম্ভ মণ্ডপম্, রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, শ্রীকৃষ্ণ মন্দির প্রভৃতি। কালাডি কেরলের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র।

এসো সংস্কৃত শিখি

কথম্ অস্তি নাস্তি?
আপনি কেমন আছেন?
মা বিস্মরতু।
ভুলবেন না।
অন্যচ্চ.....।
আর.....।
তদনন্তরম্?
তারপর
তাবদেব খলু?
এই পর্যন্ত তাহলে?

ভালো কথা

দীপাবলীতে মাটির প্রদীপ

দীপাবলীতে বাড়ি বাড়ি আলোর সাজ করা হয়। সবাই ঘর সাজায় কম দামে পাওয়া লাইট দিয়ে। কিন্তু কেউ জানে না যে, সেগুলি আমাদের দেশের নয়। আমরা সবাই উৎসব করি অথচ তা থেকে লাভ করে বিদেশের কোম্পানিগুলো। তাই এবছর আমরা বাড়িতে সেই লাইট দিয়ে সাজাইনি। তার বদলে মাটির প্রদীপ এনে জ্বালিয়েছি। মাটির প্রদীপগুলো জ্বালানোর পর খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ইলেট্রিক লাইটের থেকেও ভাল। তা দেখে অনেকে প্রশংসা করেছে আর বলেছে আগামী বছর তারাও করবে।

অপর্ণা বর্মন, ষষ্ঠ শ্রেণী, কোচবিহার।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ল রা য়া ঘ বো	(১) টা হ ঘা ণ রি
(২) ল আ বো বো তা	(২) লা শ খে র ব্দে

৩১ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর

৩১ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর	৩১ অক্টোবর সংখ্যার উত্তর
(১) ভবতারিণী (২) নখদর্পণ	(১) ধন্বন্তরি (২) কোতোয়াল

উত্তরদাতার নাম

(১) রূপসা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯ (২) শুভম পাণ্ডে, সরকার পাড়া, পুরুলিয়া (৩) ঈশিতা বর্মন, ঈশ্বরপুর উঃ দিনাজপুর (৪) সত্যম্ সরকার, ইটাহার, উঃ দিনাজপুর

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 7059591955
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

মুসলমান মেয়েদের জীবনে এক অভিশাপ—তিন তালাক

সুতপা বসাক ভড়

মুসলিম পার্সোনাল ল আবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে। তিন তালাকের বিরুদ্ধে যে আপিল করা হয়েছে, তার জবাবে মুসলিম পারসোনাল ল বোর্ড জানিয়েছে যে, পুরুষ যাতে চরিত্রহীন না হয়, সেজন্য তিন তালাক প্রথাটি খুবই জরুরি। একজন উপপত্নী রাখার থেকে বর্তমান পত্নীকে তিন তালাক দিয়ে বিদায় করে আর একটি মহিলাকে ঘরে আসার অধিকার মুসলমানদের থাকা উচিত। তাদের বক্তব্য, মহিলারা ভাবুক এবং দুর্বল, সেজন্য তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, অথচ পুরুষরা হয় এর বিপরীত। শাইস্তা অম্বর, যিনি মহিলাদের জন্য পৃথক পার্সোনাল ল বোর্ড বানিয়েছেন, তিনি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। তিন তালাকের সমর্থকদের কীভাবে মনে হলো যে মহিলারা সবসময় পুরুষদের থেকে দুর্বল? আসলে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে ওরা নিজেদের স্বার্থের জন্য মেয়েদের বাড়তে দেয় না, পর্দায় ঢেকে দিতে চায় তাদের শরীর ও মন। যতক্ষণ ইচ্ছা হলো ঘরে রাখল, তারপর তিন তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। ব্যাস্, সব সম্পর্ক, দায়িত্ব শেষ! যত অধিকার শুধু পুরুষদের জন্য? তালাকপ্রাপ্ত মহিলাটি তার সন্তানাদি নিয়ে কোথায় যাবে, কীভাবে জীবন কাটাবে সে দায়িত্ব নেবার কেউ নেই। এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের জীবনের কোনো মূল্য নেই। রাষ্ট্রীয় মহিলা আয়োগের জন্য সঈদা হামিদের রিপোর্ট --- 'ভয়েস অফ্ দ্য ভয়েসলেস'-এ পুরো দেশের মুসলমান মহিলাদের করুণ কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। এঁদের মধ্যে অনেক মহিলা তিন তালাকের বলি— তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা ও করুণ পরিণতি ল বোর্ডের চোখে পড়ে না? মুসলমান পুরুষদের সুখ-সুবিধার দিকে তাদের সহানুভূতিপূর্ণ নজর, আর মুসলমান মেয়েদের কষ্ট তাদের চোখে পড়ে না কেন?

প্রতিবাদী দুই নারী— শাহবানো ও সায়রাবানো।

সব থেকে আশ্চর্যের কথা, ওইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, সেকুলার, প্রগতিশীল, এনজিও, নেতা কোথায় গেল? অন্য সময় তো মহিলা প্রগতি, মহিলা ক্ষমতায়ণের নামে তাদের বড় বড় বক্তব্য শোনা যায়, আর এখন? আসলে তারা অনেক হিসেবি। তারা জানেন, এই ব্যাপারে মহিলাদের তরফদারি করলে ভোটব্যাঙ্কে ঘাটতি হবে, তাই সব চুপ। আগে শাহবানো, সলমন রুশদি, তসলিমা নাসরিনের ব্যাপারে একটু আধটু মন্তব্য কানে আসত। এখন তারা কী করছে? তসলিমা নাসরিন মুসলমান মহিলাদের দুঃখ-কষ্ট প্রকাশ্যে এনেছেন 'আমার মেয়েবেলা', 'লজ্জা' প্রভৃতি পুস্তকে। এজন্য কট্টর মৌলবাদী থেকে প্রগতিশীল বামপন্থীদের চক্ষুশূল হয়েছেন তিনি। এরপর হাজি আলিতে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিয়ে তৃপ্তি দেশাইকে বলা হয়েছিল যে, তিনি যেন অবশ্যই সেখানে আসেন। তার জন্য জুতোর মালা তৈরি থাকবে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তখনও চুপ্‌টি করে বসে ছিল।

বামপন্থীরা সাধারণত মুখ বুজে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডকে সমর্থন করে। অনেক মহিলা সংগঠন যেমন মহিলা দক্ষতা, জনবাদী মহিলা সমিতি, সহেলী ইত্যাদি মহিলাদের পক্ষে আন্দোলন করত— এখন তারা কোথায়? তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের করুণ অবস্থা কি এদের মাথায় ঢুকছে না? ইসলামি রক্ষণশীলতা নামে পুরুষের সব স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে মহিলাদের কেবলমাত্র ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আজ যদি উচ্চতম ন্যায়ালয় থেকে সঠিক নির্দেশ আসে এবং ওই মহিলারা মানুষ হিসাবে সমাজে স্থান পান, এর থেকে সুখের কথা কী হতে পারে? এ কেমন ধর্ম যা কেবলমাত্র পুরুষের জন্য পৃথিবীর সব ভাল ঠিক করে রেখেছে, এমনকী মহিলাদের ভাগ্যও তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে? কল্‌মা পড়ে মুহূর্তে বেগম করবে আর তিন তালাক দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতেও দ্বিধা করবে না। শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে এ কেমন নীতি যা কেবলমাত্র পুরুষজাতির সুখ-সুবিধার জন্য সদা তৎপর?

মহিলাদের সঙ্গে যত অত্যাচার, অন্যায়, অবিচার হোক্ না কেন তাও ধর্মের নামে হবে। ধর্মের চাদরে ঢেকে মহিলাদের ওপর অন্যায়-অবিচারের শেষ হওয়া উচিত। এজন্য কট্টরপন্থী মনোভাব ছেড়ে মানুষ হিসাবে একজন দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়ানোই মানুষের কর্তব্য। সুতরাং, ভোটের দিকে না তাকিয়ে মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত যে, শুধুমাত্র মহিলা হবার জন্য তিন তালাকের ভয়ে আজীবন কুণ্ঠিতা হয়ে অথবা এই নিষ্ঠুর প্রথার বলি হয়ে চলেছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মহিলারা। শাহবানো ও সায়রাবানো-মামলা শুধু আমরা জানি, কিন্তু লৌহ যবনিকার আড়ালে হাজার হাজার শাহবানো-সায়রাবানো নিষ্পেষিত হয়ে চলেছে। সব সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে মহিলাদের প্রতি হতে থাকা অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত এবং যা সঠিক, উপযুক্ত তাও যেন প্রাপ্য হয় তাঁদের— এটা দেখা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কর্তব্য। ■

ঔপনিবেশিক আমলের গোঁড়ামি পরিত্যাগ করা সময়ের দাবি

অতিথি কলম

আহতেশ খান

মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (Personal Law Board) নিয়ে স্যার সৈয়দ যে সংস্কারের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের এখুনি তা নিয়ে সোচ্চার হওয়া দরকার।

পৃথিবীর যে প্রান্তেই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা থাকুন না কেন, তাঁরা এই বছরেই স্যার সৈয়দের ১৯৯ বছরের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করবেন। তিনি যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলেন তার কতটুকুই বা বাস্তবে আজ পর্যন্ত রূপায়িত হয়েছে? সৈয়দ আহমেদ খান আধুনিক শিক্ষা, মুসলমানদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা ও সর্বোপরি আধুনিক জ্ঞানের পরিমণ্ডলে কোরান শরিফের যথাযথ ব্যাখ্যার জন্য সর্বদা লড়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান সেপাই অংশ নিয়েছিল এবং ব্রিটিশ শাসকরা তা নির্মমভাবে দমন করার পর সৈয়দ লক্ষ্য করেছিলেন মুসলমান সমাজের হতাশা ও আতঙ্কের ভাব। তিনি তখনই অনুভব করেছিলেন মুসলমান সমাজের প্রাচীন ভাবনায় আবদ্ধ থাকা থেকে দরকার আশু মুক্তি। দরকার শিক্ষার। তিনি সরাসরি ইসলামের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যার ওপর জোর দেন যাতে তা তৎকালীন ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় 'রেঁনেসা' আন্দোলনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উদারবাদী হয়। পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় ইসলামির গোঁড়ামি থেকে প্রায় ফসিল হতে যাওয়া কোরানের পুনরুদ্ধারই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের (এএমইউ) প্রাসঙ্গিকতা। এই প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু স্যার সৈয়দের শিক্ষা সংস্কারের আদর্শকে তুলে ধরবে এমনটাই ধরে নেওয়া হয়েছিল। এই উপমহাদেশে মুসলমান শিক্ষাজগতে এ এম ইউ একটি পুরোধা প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশভাগের যন্ত্রণার ও সেই বিক্ষুব্ধ সময়কে মোকাবিলা করেও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। কিন্তু স্যার সৈয়দ শিক্ষার প্রসার ছাড়াও চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজের সংস্কার ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা নেবে। পরিতাপের বিষয়, মুসলমান সমাজ সংস্কারের সূতিকাগার হওয়ার ক্ষেত্রে এ এম ইউ ব্যর্থ হয়েছে।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, এখানকার যে ধর্মতত্ত্বের (Theology) বিরাট বিভাগ রয়েছে তা কেবলমাত্র ছাত্র ও শিক্ষাবাসগুলির মধ্যে মুসলমান ধর্মের আচার বিচার নিয়েই ব্যাপৃত থাকে। কখনও ইসলামীয় আইনবিধির (Islamic Jurisporudence) যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও দেশের মধ্যে তার যথার্থ প্রয়োগ করার কথা চিন্তাও করে না। এরই ফলে সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতের মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সব থেকে বেশি রক্ষণশীল ও গোঁড়া।

এখানে বলা প্রয়োজন, দেশের মুসলমানরা আজ যে সমস্ত ব্যক্তিগত আইনের প্রসঙ্গ উঠলেই অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে পড়েন সেগুলির অধিকাংশই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ আমলের চরম রক্ষণশীল ইংরেজ বিচারকদের ভুল রায়দানের ফল। ইতিহাস অনুযায়ী ১৮২০ থেকে ১৮৫৭ সালের সময়কালে ইংরেজরা ভারতে প্রচলিত ধর্মীয় আচরণ বিধির ওপর সংস্কারের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এর মধ্যে অনেকেই জানেন সতী বা সহমরণ প্রথা তুলে দেওয়া বা বিধবা বিবাহ প্রচলনের মতো যুগান্তকারী সব সংস্কার রয়েছে। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করে ইতিহাসবিদরা দেখেছেন এই সব নানা সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করাই ছিল বিদ্রোহের একটি অন্যতম কারণ। এরই ফলে ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পর ইংরেজরা সমাজ সংস্কারের বিষয়ে অনেকটাই নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। তাদের মনে হয় ধর্মীয় অনুশাসনগুলির বিষয়ে নিজেদের স্বার্থেই আর বিশেষ নাকগলানো বা সংস্কারের দরকার নেই। উল্টে নিজেদের অবস্থান নিরাপদ রাখতে ভারতীয় সমাজের

দেশভাগের পর ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও শিক্ষিতদের বড় অংশই পাকিস্তানে চলে যায়। ভারতে মুসলমান বুদ্ধিজীবী বলে তেমন একটা প্রাণবন্ত সমাজ গড়েই ওঠেনি। সমাজের বিকৃতিগুলির ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করার মতো কোনো বুদ্ধিজীবী শ্রেণী না থাকাটাও মুসলমানদের সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বড় বাধা।

তুলনামূলকভাবে ধনবান, প্রতিষ্ঠিত কিন্তু গোঁড়া ও রক্ষণশীল সমাজপতিদের সঙ্গেই তারা হাত মিলিয়ে চলতে থাকে।

আর এরই বিষময় পরিণাম হয় প্রাচীনপন্থী মুসলিম ব্যক্তিগত আইন রক্ষকদের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ায়। এই মর্মে ১৯১৭ সালে তাজবি আবালাল দেশাই বনাম মৌলানা আলি খান দেশাই মামলাটি গুরুত্বপূর্ণ। এই মামলার বিচারক বি স্কট ও এম বিমান-এর বেঞ্চ একটি অত্যন্ত রক্ষণশীল বহুবিবাহ আইনকে চালু করার ভিত তৈরি করেন। ১৯৩৭ সালে শরিয়ত আইনকেও রক্ষণশীলদের খেয়ালখুশির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী সময়ের রক্ষণশীলদের তুমুল বিরোধিতা সত্ত্বেও দেশে প্রচলিত অন্য ধর্মগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনে বহু সময়োপযোগী পরিবর্তন ও সংস্কার করা হয়। কিন্তু পর পর আসা বহু সরকারই মুসলিম ব্যক্তিগত আইনকে ছোঁবার সাহস দেখায়নি। কেননা তাঁদের মনে হয়েছিল ভোট জোগাড়ের ক্ষেত্রে তা নিরাপদ নয়। তাই 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন'-এর উপর মান্ধাতা মোল্লাবাহিনীর একচ্ছত্র অধিকার আজও।

কিন্তু একটু নজর করলেই দেখা যাবে বিশ্বের এমন কিছু দেশ যাদের আমরা সচারাচর অত্যন্ত বেশি রকমের রক্ষণশীল বলে মনে করি যেমন সৌদি আরব, তুরস্ক, পাকিস্তান বা ইরাক— এই দেশগুলি কিন্তু ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পরিবর্তন অনেক আগেই করে নিয়েছে। এর মধ্যে অনেক দেশেই 'বহু বিবাহ প্রথা' ও 'তিন তালাক'-এর মতো তথাকথিত শরিয়ত আইন রেখেও হয় তারা সেগুলি পুরোপুরি বিলোপ করেছে বা যথেষ্ট অদলবদল ঘটিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে নানান নিয়ন্ত্রণ জারি করেছে। কিন্তু হায়! ভারতবর্ষে এই কুপ্রথাগুলি ইংরেজ জমানার ভুল ব্যাখ্যা সম্বল করে ও ব্যক্তিগত আইনের ও কোরানের দোহাই দিয়ে দাপটের সঙ্গে টিকে আছে। যখন একের পর এক সরকার মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের পরিবর্তন আনা থেকে গা বাঁচিয়ে দূরে থেকে যাচ্ছে তখন তো দরকার ছিল তথাকথিত উদারবাদী বুদ্ধিজীবীদের সঠিক ভূমিকা পালন করার। কিন্তু দেশভাগের পর ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠিত ও শিক্ষিতদের বড় অংশই পাকিস্তানে চলে যায়। ভারতে মুসলমান বুদ্ধিজীবী বলে তেমন একটা প্রাণবন্ত সমাজ গড়েই ওঠেনি। সমাজের বিকৃতিগুলির ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করার মতো কোনো বুদ্ধিজীবী শ্রেণী না থাকাটাও মুসলমানদের সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বড় বাধা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এ এম ইউ-এর একটা কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার বিশেষ তাগিদ থেকে যায়। কিন্তু স্যার সৈয়দ যে সংস্কারক্ষম ভূমিকা নেওয়ার কথা বারবার বলেছিলেন এ এম ইউ তা বিস্মৃত হয়ে মৌলবাদী 'দেওবন্দীদের' অর্থাৎ চরম রক্ষণশীলদের হাতেই সেই ভূমিকা সমর্পণ করে।

সম্প্রতি সর্বোচ্চ আদালতে বহু বিবাহ ও তিন তালাকের ক্ষেত্রে দেশে মেয়েদের অধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গে তারা যে সমমর্যাদা ও ন্যায় বিচার হারাচ্ছে এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সরকারের তরফে দ্ব্যর্থহীনভাষায় হলফনামা দিয়ে বলা হয়েছে ওই দুই প্রথাকে মেয়েদের লিঙ্গ বৈষম্য, সমান অধিকার ও সংবিধান স্বীকৃত সমমর্যাদার নিরিখেই বিচার করা উচিত। এই মামলার ফলে আমার মনে হয় ভারতের মুসলমানদের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সুযোগ এসেছে যাতে তারা ব্রিটিশ আমলের বিচারকদের ভ্রান্ত রায় থেকে বেরিয়ে এসে কোরানের শিক্ষাকে যথাযথ ব্যাখ্যা করে নিজেদের পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার সমান অধিকার দিতে পারে। প্রায় দু'শো বছর কেটে গেছে সৈয়দ-নির্দেশিত প্রাগৈতিহাসিকতা থেকে বেরিয়ে আধুনিক সমাজের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কোরানের নির্দেশ পুর্নমূল্যায়ন করার ব্যর্থতায়।

এ এম ইউ-কেই আজ এগিয়ে আসতে হবে কোরানের ইতিবাচক ব্যাখ্যা নিয়ে শুধু নয়, সমগ্র মুসলমান সমাজে এক বহু প্রতীক্ষিত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনা করার। দেশের মুসলমান সমাজের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যথেষ্ট সম্ভ্রম ও সমীহ রয়েছে। এই সম্মানকে অস্ত্র করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত মুসলমান সমাজকে সঠিক পথে চালনা করা--- তাদের সু-সংস্কারকে মেনে নিতে রাজি করানো। পরিবর্তনের বার্তাবহ হয়ে কাজ করার এই সুযোগ। তাঁরা এগিয়ে এসে ঠিক-বেঠিক নির্দেশ করলে মুসলমান সমাজের গরিষ্ঠাংশের ব্যক্তিগত আইনে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সম্মতি দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ এ এম ইউ-এর বিশ্বাসযোগ্যতা আজও মুসলমান সমাজের কাছে অটুট। তাই বহু প্রয়োজনীয় সংস্কার বা বিলোপ যা অন্যান্য মুসলমান দেশে ইতিমধ্যেই হয়েছে তা যদি আনা যায় সেক্ষেত্রে এ এম ইউ-র ভূমিকাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

(লেখক ইন্টারন্যাশনাল রেভিনিউ সার্ভিস অফিসার এবং আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির প্রাক্তনী)

পূর্ণকালীন কার্যকর্তা চাই

গো-ভিত্তিক গ্রাম বিকাশের জন্য

গো-সেবা পরিবার গ্রাম বিকাশের জন্য গো-ভক্ত, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী ব্যক্তিদের পূর্ণ সময় দিয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। এই কাজের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক। বয়স ৩৫ থেকে ৪৫ বছর। গো-সেবা পরিবার থাকা ও সেবানিধির ব্যবস্থা করবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন।

গো-সেবা পরিবার

৫২৪ বি, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০০৩

ফোন নং - ৯৩৩১০২৭৪৭১ (ADVT.)

সিপিএম এবং ইসলামি জেহাদির আক্রমণ

কেরল ও তামিলনাড়ুতে স্বয়ংসেবকের রক্তপাত অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কেরলে আরও একজন স্বয়ংসেবক সিপিএমের গুণ্ডাদের ছুরিতে প্রাণ হারালেন। বিজেপির কর্মী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ১৯ বছরের রমিতের বাড়ি কান্নুর জেলার ধর্মাদামে। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের গ্রামের বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রমিতকে গাড়ি থেকে নামিয়ে হত্যা করে আততায়ীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রমিতের বাবা উথামনও ছিলেন স্বয়ংসেবক এবং বিজেপির কর্মী। ২০০২ সালে তাঁকেও সিপিএমের গুণ্ডারা খুন করেছিল।

সাধারণভাবে ভাবে জানা গেছে কিছুদিন আগে সিপিএম কর্মী কে. মোহাননের হত্যাকাণ্ডের বদলা নেবার জন্যে রমিতকে খুন করা হয়েছে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে, মোহানন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে দলের কোনো যোগাযোগ নেই। বস্তুত কান্নুরের সাধারণ মানুষের একাংশের বিশ্বাস সিপিএমের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই মোহানন খুন হয়েছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন কেরলের সিপিএম নেতা এবং শিল্পমন্ত্রী ইপি জয়রাজনের বিরুদ্ধে ওঠা স্বজনপোষণের অভিযোগ এবং সেই সংক্রান্ত বিতর্ক থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দেবার জন্যই রমিতকে হত্যা করা হয়েছে।

রমিতের শেষযাত্রায় শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি কুম্মানাম রাজাশেখরণ ও বর্ষীয়ান নেতা ও রাজাগোপাল।

রাজ্যের শীর্ষনেতৃত্ব স্বজনপোষণে জাড়িয়ে পড়ায় সিপিএমের কর্মীরাও যথেষ্ট ক্ষুব্ধ।

বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা ও. রাজাগোপাল এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, কান্নুর জেলার রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ করার জন্য কেরলের মুখ্যমন্ত্রী কোনো উদ্যোগই নিচ্ছেন না। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি কুম্মানাম রাজাশেখরন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রেমিত হত্যাকাণ্ডের মাত্র দু'দিন আগে তিরুঅনন্তপুরম শহরের কান্নামুলাম পুথেনপালম কলোনিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একটি শাখার গণশিক্ষক এবং বিজেপির মণ্ডল-সভাপতি বিষ্ণু খুন হন। মাত্র ১৮ বছর বয়েসেই বিষ্ণু স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন বলে খবরে প্রকাশ।

অন্যদিকে, গত ৮ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারকের ওপর হিন্দুত্ববিরোধী শক্তির নির্লজ্জ আক্রমণের পর থেকে উত্তাল হয়ে উঠেছে চেন্নাই-সহ সমগ্র তামিলনাড়ু। আক্রমণের শিকার যারা হয়েছেন, বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা হয়েছে। যে স্লোগান তারা তুলেছেন তাতে জাতীয়তাবাদী শক্তি আরও সুদৃঢ় হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বস্তুত, কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তামিলনাড়ুতে রাজনৈতিক হিংসা বেড়ে গেছে। গণেশ চতুর্থীর দিন হিন্দু সংগঠনগুলির ঈর্ষনীয় পুনরুত্থান এবং রাজ্যে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়ে ইসলামিক মৌলবাদীরা তাদের পুরনো খেলা সন্ত্রাস কায়েম করতে মাঠে নেমে পড়েছে।

ঘটনার দিন সঙ্ঘের প্রচারক নরহরি অফিস যাবার সময় চেন্নাইয়ের ত্রিপলিকেন অঞ্চলে আক্রান্ত হন। আত্মরক্ষার জন্য তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'থুলুক্কানরা (স্থানীয় তামিল ভাষায় মুসলমান) আমায় মেরে ফেলল। বাঁচাও'। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। শরীরে একাধিক ফ্র্যাকচার নিয়ে তিনি অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি হন। ভাগ্য ভালো তাই প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু আরেক বিজেপি কর্মী জনার্দনের ভাগ্য সহায় ছিল না। তাঁকে প্রকাশ্য রাস্তায় হত্যা করা হয়।

সঙ্ঘ এবং বিজেপির ওপর মুসলমান মৌলবাদীদের আক্রমণ তামিলনাড়ুতে নতুন নয়। এই প্রসঙ্গে সঙ্ঘের এক প্রধান প্রচারক বলেন, 'আশির দশকের গোড়ায় বিজেপি নেতা জনা কৃষ্ণমূর্তির হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসের সূচনা হয়েছিল। ১৯৮২ সালে কন্যাকুমারী জেলার সনদাইকাড়ু এবং তিরুনেলভেলি জেলার মীনাক্ষীপুরমে ব্যাপক গণধর্মান্তরকরণ শুরু হলো। এই সময় হিন্দুরা আত্মরক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেন। তাঁরা বুঝেছিলেন নেকড়ের কাছে দয়াদাক্ষিণ্য প্রার্থনা করার থেকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বেশি জরুরি। সেই গণচেতনাই ছিল তামিলনাড়ুতে সঙ্ঘ ও বিজেপির পথ চলার পাথেয়। ১৯৮৯ সালে কোয়েম্বাটোরে হিন্দু মুন্নানি কর্মী বীরা গণেশ ইসলামি মৌলবাদী সংগঠন আল-উম্মাহ্-র জিহাদিদের হাতে খুন হন। আরেক হিন্দু মুন্নানি নেতা রাম গোপালনজির ওপরও হামলা হয়েছিল।' সম্ভবত অনেকেরই মনে পড়বে লালকৃষ্ণ আদবানীর জনসভা শেষ হবার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কোয়েম্বাটোরে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। স্রেফ ভাগ্যের জোরে আদবানীজী সেবার বেঁচে যান। সেই সময় অল্প কয়েকজন মানুষ হিন্দুদের স্বার্থরক্ষায় লড়াই করতেন। এখনও তালিনাড়ুর মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে পারেন না। এমনকী পুজোপার্বণে আলপনা দেওয়াও নিষিদ্ধ।

যাইহোক, আশির দশকের পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। সঙ্ঘের প্রচারক এবং বিজেপির কর্মীদের ওপর মৌলবাদীদের আক্রমণ আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। ডিএমকে ক্ষমতায় থাকার সময় অসংখ্য মৌলবাদী নেতাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল। বর্তমান শাসক এ আই ডি এম কে তাদের মুসলমান তোষণের জন্য বিখ্যাত। তাদের তোষণনীতির ফলে মুসলমান মৌলবাদীরা কলার তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐতিহাসিক আর. গৌতমন এই প্রসঙ্গে বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই তামিলনাড়ু ভাষাগত এবং ধর্মীয় (ইসলামিক) বিচ্ছিন্নতাবাদের ধাত্রীভূমি। দ্রাবিড় জাতিবাদের আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে দ্রাবিড় বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করার জন্য ব্রিটিশরা জাস্টিস পার্টির মতো কিছু প্রথার পত্তন করেছিল। আবার একইসঙ্গে মুসলিম লীগকে সমর্থন করার মাধ্যমে জন্ম দিয়েছিল ইসলামি বিচ্ছিন্নতাবাদের। দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিতে মুসলিম লীগের অভ্যুত্থান নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অঞ্চলে যেসব মুসলমান বসবাস করেন তাদের একটা বড়ো অংশ এখনও মুসলিম লীগের সমর্থক এবং সেই কারণে ইসলামি বিচ্ছিন্নতাবাদ ও জঙ্গিবাদেরও সমর্থক।'

হিন্দু এবং স্বয়ংসেবক নিধনের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট খুঁজতে গিয়ে গৌতমন বলেন, 'ডিএমকে জমানায় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে জিহাদিরা আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে গণেশ চতুর্থী উৎসবে তাদের আগ্রাসন বেশি বোঝা যায়। কখনও তারা মণ্ডপে বিগ্রহ স্থাপনে বাধা দেয় কিংবা বিসর্জনের শোভাযাত্রায় হামলা করে অথবা মূর্তি ভেঙে দেয়। ২০০৬ সালের পর থেকে এটা ক্রমশ বাড়ছে। মনিথা নীথি পসারাই (এম এন পি) এইসব জিহাদিদের অত্যাধুনিক অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এম এন পি, তামিলনাড়ু মুসলিম মুন্নেত্রা কাঝাগ্রামের (টিএমএসকে) শাখা সংগঠন। টিএমএসকে জঙ্গি শিবির চালায়, সন্ত্রাসবাদে মদত দেয়। অথচ নির্বাচনে জেতার জন্য এ আই এ ডি এম কে এম এন পি-র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিল। সিমি নিষিদ্ধ হবার পর এদেরই অনুপ্রেরণায় আল-উম্মাহ্-র মতো সংগঠন তৈরি হলো। পরে, ১৯৯৩ সালে এরাই সঙ্ঘের কার্যালয় আক্রমণ করে। ১১ জন মারা যায়। ১৯৮৯ থেকে শুরু করে আজ অবধি ১৮৯ জন মারা গেছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই সঙ্ঘের কার্যকর্তা। নয়তো হিন্দু মুন্নানি কর্মী।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সঙ্ঘ এবং হিন্দু মুন্নানির মতো সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের হিন্দুদের রক্ষাকবচের কাজ করছে। কিন্তু মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক নিজের কোলে টানার লোভে সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রত্যাহার এবং ইসলামিক মৌলবাদীদের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাতের ফলে তামিলনাড়ু সন্ত্রাসবাদের সূতিকাগার হয়ে উঠেছে। পুলিশ এবং প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি কী পরিমাণ আতঙ্ক তাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। গৌতমন বলেন, 'দ্রাবিড় রাজনীতির ভিত্তিই ছিল হিন্দুত্ব এবং জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা। ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি তাঁর সুযোগ নিয়েছে। এই পরিণতি যথেষ্ট আতঙ্কের হলেও অস্বাভাবিক নয়।'

পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যদি এখনই যথাযথ পদক্ষেপ না করে তাহলে তামিলনাড়ুও একদিন কাশ্মীরে পরিণত হবে। এখন তামিলনাড়ুতে মুসলমানরা মোট জনসংখ্যার ৬.৫ শতাংশ। এই সংখ্যা যদি কোনোভাবে ৮ শতাংশ পেরোয় তা হলে তা রাজ্যের জনবিন্যাসের প্রেক্ষিতে বিপজ্জনক বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এমনিতেই দক্ষিণ ভারত ইসলামিক স্টেটের জিহাদিদের অন্যতম অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় তামিল নেতারা যদি একই সঙ্গে দ্রাবিড় জাতিবাদ এবং মুসলমান তোষণনীতি বহাল রাখেন তাহলে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। মনে রাখা দরকার, দ্রাবিড়রাও হিন্দু। আর সেই কারণেই ভারতীয়ত্বের সঙ্গে দ্রাবিড়ত্বের কোনো বিরোধ থাকা উচিত নয়।

কেরলে সিপিএমের হিংসাত্মক কাজের তীব্র নিন্দা করল সঙ্ঘ

সম্প্রতি হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের বৈঠকে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব দুটি এখানে প্রকাশ করা হলো।

প্রস্তাব-১

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও অন্যান্য বিরোধীদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যে নিরন্তর হিংসাত্মক কাজ করে চলেছে, অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল তার তীব্র নিন্দা করছে। ১৯৪২-এ কেরলে সঙ্ঘের কাজ শুরু হওয়ার সময় থেকেই নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ভাবনা, একতা ও একাত্মতার ভাবনা জাগরণের মতো পবিত্র কাজ করে চলেছে এবং এর ফলে সঙ্ঘের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও প্রভাবে হতাশাগ্রস্ত বামপন্থীরা, বিশেষত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএম) সঙ্ঘের শাখা ও কার্যকর্তাদের উপর অকারণ ও নৃশংস আক্রমণ করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে ধ্বংস করার এই নিষ্ফল প্রয়াসে ব্যস্ত মার্কসবাদ এমন এক বিচারধারা যার মূল উদ্দেশ্য শুধু অসহিষ্ণুতা নয়, একাধিপত্য বিস্তারও।

গত সাত দশক ধরে কেরলে রক্তপিপাসু কমিউনিস্ট পার্টি ক্যাডাররা তাদের নেতাদের মৌন সম্মতি ও সহযোগিতায় সঙ্ঘের ২৫০ জনেরও বেশি উৎসাহী ও উদীয়মান যুবক কার্যকর্তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং বহু নারী ও পুরুষকে ভীষণভাবে আহত করে অক্ষম করে দিয়েছে। সঙ্ঘের এই নিহত ও নির্যাতিত কার্যকর্তাদের সর্বাধিক সংখ্যা কন্নুর জেলাতেই রয়েছে যা মার্কসবাদীদের দুর্গ বলে পরিচিত। সঙ্ঘের স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, পরিচ্ছন্ন রীতিনীতি এবং জাতীয়তাবোধের ভাবনায় কমিউনিস্ট ক্যাডাররা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে--- এতেই

মার্কসবাদীরা বিশেষভাবে বিচলিত হচ্ছে।

সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গেই দ্বেষ নয়— এই আদর্শ নিয়ে সঙ্ঘ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রীতি, ঐক্যবোধ ও সমরসতা সৃষ্টির কাজ করে চলেছে। সবরকমের মতাবলম্বী থাকা সত্ত্বেও সঙ্ঘ সর্বদা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির কাজ সততার সঙ্গেই করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের ভাবনা মতো বিবেক বর্জিত হিংসা ও অত্যন্ত নিন্দাজনক কাজ করে চলেছে।

গত ১১ জুলাই ২০১৬ ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের শ্রীরামচন্দ্রনকে তাঁর বাড়িতে স্ত্রী-র সামনেই, প্রাণ ভিক্ষার কাকুতি-মিনতি সত্ত্বেও নৃশংসভাবে হত্যা করে। গত ১২ অক্টোবর, ২০১৬ শ্রী রমিত যখন তাঁর গর্ভবতী বোনের জন্য ওষুধ আনতে যাচ্ছিলেন তখন দিনদুপুরেই তার বাড়ির সামনে তাঁকে হত্যা করা হয়। রমিত তাঁর পিতার একমাত্র পুত্র এবং তাদের পরিবারের একমাত্র জীবিকা-উপার্জনকারী। তাঁর বাবা শ্রী উত্তমন একজন বাসচালক ছিলেন। মার্কসবাদী গুণ্ডারা তাঁকেও বাস চালানোর সময় হত্যা করে। মার্কসবাদীদের সাম্প্রতিকতম নৃশংসতার উদাহরণ রমিত-হত্যা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের উপর শুধু নয়, তাদের আদি সংগঠন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি-সহ বর্তমান জোট সঙ্গী, যেমন আর এস পি, জনতা দল ইত্যাদির বিরুদ্ধেও হিংসাত্মক আক্রমণ করে চলেছে। ২০১২-র ৪ মে শ্রী টি পি চন্দ্রশেখর নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার পর এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যারাই তাদের দল ছেড়েছে তারাই মার্কসবাদী হিংসার শিকার হয়েছে। বিড়ম্বনার বিষয় হলো গরিব, অবহেলিত, দলিত ও সংখ্যালঘুদের রক্ষক হিসেবে দাবি করা মার্কসবাদীদের হাত থেকে সেরকম পরিবারের মহিলা ও শিশুরাও রেহাই পায়নি।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে

বামপন্থী লোকতান্ত্রিক জোট যখনই ক্ষমতায় এসেছে, তখনই সিপিএম গৃহমন্ত্রণালয় তাদের নিজেদের কাছে রেখেছে এবং পুলিশকে নিজেদের কব্জায় রেখে দলের ক্যাডারদের অভয় দিয়েছে এবং সঙ্ঘের শাখা ও কার্যকর্তাদের উপর নৃশংস আক্রমণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। শুধু সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের উপর হিংসাত্মক আক্রমণ নয়, তাদের ফসল, বাড়িঘর, আসবাবপত্র, গাড়ি ইত্যাদিও নষ্ট করে দিয়েছে। সিপিএমের এই গণতন্ত্রবিরোধী ও অসহিষ্ণু কাজ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো,ছোট ছোট বিষয় নিয়ে যারা মুখর হয়, তারা কিন্তু এই বিষয়ে মৌন থেকেছে।

এটা গর্বের বিষয় যে, এত অত্যাচার ও নৃশংস হত্যার পরও আমাদের কার্যকর্তাদের মনোবল অটুট রয়েছে এবং আরও জোরের সঙ্গে সঙ্ঘের আদর্শকে বিস্তার করার জন্য তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এরই সঙ্গে সঙ্ঘের গতিবিধিও দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। এইসব কার্যকলাপের ফলে সমাজের বৃহদংশের সমর্থন ও সহযোগিতাও পাওয়া যাচ্ছে।

অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল কেরল সরকার এবং সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিও আহ্বান জানাচ্ছে যে, হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক এবং কেরলে আইনের শাসন সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল সংবাদমাধ্যম ও জনসাধারণকেও আহ্বান জানাচ্ছে যে, সিপিএমের হিংসাত্মক কাজকর্মের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য বিভিন্ন মঞ্চে তাঁরা যেন সোচ্চার হন।

প্রস্তাব-২

বর্তমান বিশ্ব-সঙ্কটের সমাধান : একাত্ম মানবদর্শন

বিশ্বের সামনে প্রকটিত বর্তমান চ্যালেঞ্জের সম্পর্কে অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের সুচিন্তিত মত হলো যে, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কৃত শাশ্বত ভারতীয় চিন্তনের ভিত্তিতে প্রতিপাদিত 'একাত্ম মানবদর্শন'-এর অনুসরণেই এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। স্থাবর- জঙ্গম-সহ সমগ্র সৃষ্টির প্রতি লোক-কল্যাণের একাত্ম দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পূর্ণ জগতের পালন ও পোষণের ভাবই এই দর্শনের ভিত্তি।

বর্তমানে সারা বিশ্বে ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্য, পরিবেশে ভারসাম্যহীনতা ও সন্ত্রাসবাদ বিশ্বমানবতার জন্য এক ভীষণ বিপদের কারণ রূপে দাঁড়িয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদ ও শ্রেণীসংঘর্ষের কমিউনিস্ট চিন্তাধারা গ্রহণ করার কারণেই আজ সারা বিশ্বে বেকারি, দারিদ্র্য, অপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশে বেড়ে চলা আর্থিক সঙ্কট এবং দুই-তৃতীয়াংশের অধিক উৎপাদনে কতিপয় দেশের বহুজাতিক কোম্পানির আধিপত্য ইত্যাদি সমস্যা অত্যন্ত চিন্তাজনক। পার্থিব চাহিদার ওপরই কেন্দ্রীভূত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পরিবারগুলিতে ভাঙন ও মনোবিকৃতি তীব্রভাবে বাড়ছে। প্রকৃতির লাগামহীন শোষণের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধি, বায়ু-জল-মাটির দূষণ, জলসঙ্কট, উর্বর জমি ধীরে ধীরে বন্ধ্যা হয়ে যাওয়া এবং বহু প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মতো বিপদ বেড়ে চলেছে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ধর্মীয় মৌলবাদ ও উগ্রবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শে উদ্ভূত সন্ত্রাসবাদ ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করে ফেলেছে। এর পরিণামস্বরূপ শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা অবাধ গতিতে বেড়ে চলেছে। এসব বিষয়ে কার্যকারী মণ্ডল গভীর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছে। এসবের সমাধান একাত্ম মানবদর্শন ভিত্তিক ভাবনা, যা ব্যক্তি থেকে বিশ্ব এবং তার জীব-বৈচিত্র্যের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় থেকেই সম্ভব। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, বিশ্ব, সমগ্র সৃষ্টি এবং পরমেষ্ঠী অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্মভাব থেকেই সমস্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ ও অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সঙ্গে নিরন্তর উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা যেতে পারে।

১৯৯২ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে রিও-ডি-জেনেরিও-তে আয়োজিত বিশ্ব সম্মেলনে ১৭২টি দেশ বিশ্বশান্তি, নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করে। সেই লক্ষ্য থেকে বিশ্ব এখন নিরন্তর দূরে সরে যাচ্ছে। ২০১৫ সালে প্যারিস সম্মেলনে আবার বিশ্বের অধিকাংশ দেশ বিশ্ব-উষ্ণায়ন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পৌঁছনোর শপথ গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য প্রয়োজন সমস্ত দেশকে একাত্মবিশ্বের অঙ্গ হিসেবে উপকরণ সমূহের মর্যাদাপূর্ণ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে সবার সম্মিলিত উন্নয়নের প্রয়াস করা। সেই সঙ্গে জনসাধারণ এই একাত্মভাবে পরিবার, সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সমন্বয়মূলক আচরণ করলে পৃথিবীতে বিনা যুদ্ধ ও বিবাদে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

এ বছর পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ এবং তাঁর শাশ্বত ভারতীয় ভাবনার সময়োপযোগী তত্ত্বের অবতারণা— একাত্ম মানবদর্শনের ৫১ তম বর্ষ। এ বছর এই দর্শনের ক্রিয়ান্বয়নের উপযুক্ত সময় মনে করে অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সমস্ত নাগরিক, কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যসরকার এবং বিশ্বের চিন্তাবিদদের আহ্বান করছে যে, তাঁরা যেন প্রকৃতি সহ-সমগ্র বিশ্বের সমস্ত অবয়বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সমস্তরকম প্রয়াস করেন। এজন্য উপযুক্ত প্রতিচ্ছবি (মডেল) দাঁড় করার সঙ্গে এই ভাবনার ক্রিয়ান্বয়নের জন্য যথার্থ প্রয়োগও করতে হবে। এর ফলে সারা পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর জীবন সুখময় হবে এবং জনকল্যাণের দিশা প্রাপ্ত হবে। ■

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি কপি ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা

জল যখন জ্বালানি

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জল ঢেলে আগুন নেভানো হয়। প্রবল জ্বরে মাথায় জলপট্টি দিয়ে উত্তাপ কমানোর রেওয়াজ এখনও আছে। কিন্তু কেউ যদি বলেন জলের সাহায্যে তাপ সৃষ্টি করা যায় এবং সেই তাপকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে গাড়ি চালানো যায়, তাহলে আশ্চর্য হতেই হবে। তবে শুধু আশ্চর্য হলে চলবে না। বিশ্বাসও করতে হবে। কারণ এমন একজন মানুষের সন্ধান মিলেছে— তিনি এইসব 'গাঁজাখুরি' কথাবার্তা বিশ্বাস করাতে বাধ্য করবেন।

নতুন জ্বালানি অ্যাসিটিলিনের উদ্ভাবক রইস মাকরানি।

ঘটনাস্থল মধ্যপ্রদেশ। জেলার নাম সাগর। এই জেলার এক বাসিন্দা রইস মেহমুদ মাকরানির আবিষ্কার সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এবার থেকে জল হবে গাড়ির জ্বালানি। পেট্রোল-ডিজেলের পরিবর্তে জল এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইডের মিশ্রণের সাহায্যে গাড়ি চলবে। মাকরানি সাহেব ইতিমধ্যেই তাঁর তৈরি জ্বালানির মাধ্যমে গাড়ি চালিয়ে দেখিয়েছেন। দেশে বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে তাঁর উদ্যোগ।

পারিবারিক সূত্রে রইস মাকরানি একটি মোটর গ্যারাজের মালিক। বিগড়ে যাওয়া গাড়ি ঠিক করা তাঁর পেশা। কিন্তু তা-ই বললে কী হয়! ছেলেবেলা থেকে তাঁর নানারকম 'এক্সপেরিমেন্ট' করার নেশা। একটা করে জিনিস বানান আর আব্বুর কাছে ছুটে যান। আব্বুও উৎসাহ দেন। বড় হবার পর সেই নেশা আরও পাকাপোক্ত ভাবে গেড়ে বসল। পেট্রোল-ডিজেলের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি এবং পরিবেশ দূষণ— এই দুটি ভাবনা মাথায় রেখে তিনি শুরু করলেন বিকল্প জ্বালানির গবেষণা। সেটা ২০০৭ সাল। তারপর থেকে দিনে কখনও ১৬ ঘণ্টা কখনও বা ১৮ ঘণ্টা কাজ করে দু' বছরের মাথায় মিলল সন্ধান। জলের সঙ্গে ক্যালসিয়াম কার্বাইড মেশালে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন গ্যাস তৈরি হয়। এই অ্যাসিটিলিনের হাতেই রয়েছে দুষণহীন জ্বালানি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। পদার্থবিদ্যার ছাত্রমাত্রেই জানেন, শক্তি সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংসও করা যায় না। শুধু রূপান্তরিত করা যায়। রইস মাকরানি এই সূত্রের প্রয়োগ ঘটালেন। অ্যাসিটিলিন থেকে উদ্ভূত তাপশক্তি রূপান্তরিত হলো গতিশক্তিতে এবং একটি মারুতি-৮০০ পেট্রোল-ডিজেল ছাড়াই চলল। এই জ্বালানি সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত। আর দাম? পাঠক, চমকে উঠবেন না। ১০ থেকে ২০ টাকা প্রতি লিটার। রইস মাকরানি বলেছেন, 'অ্যাসিটিলিন গ্যাস যদি তরল আকারে উৎপাদন করা যায় তা হলে গাড়িশিল্পে বিপ্লব এসে যাবে। এই জ্বালানি শুধু সস্তাই নয়, ইউজার-ফ্রেন্ডলিও।'

কিন্তু শুধু জ্বালানি বানালেই চলবে না। তার উপযোগী ইঞ্জিনও চাই। মাকরানি সাহেব তা-ও বানিয়েছেন। তাঁর তৈরি ইঞ্জিনের আয়তন ৭৯৬ সি সি। সর্বোচ্চ গতি ৫০-৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়।

সম্প্রতি চীনের একটি গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার আমন্ত্রণে তিনি চীনে গিয়েছিলেন। সংস্থাটি ইঞ্জিন এবং জ্বালানি সংক্রান্ত উচ্চতর গবেষণায় তাঁকে সবরকম সাহায্য করতে চায়। শর্ত একটাই, মাকরানি সাহেবকে চীনে গিয়ে কাজ করতে হবে। দুবাই-য়ের কয়েকটি সংস্থাও তাঁকে একই ধরনের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু তিনি রাজি হননি। কারণ বিদেশি প্রস্তাব তাঁর ভারতীয়ত্বের অহঙ্কারে ঘা দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'বিদেশ থেকে যে প্রস্তাবই আসুক আমি দেশ ছেড়ে যাব না। রেডিয়োর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী যেদিন মেক-ইন-ইন্ডিয়া প্রকল্পের কথা বললেন সেদিনই খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। ঠিক করেছিলাম যা করব দেশে থেকেই করব। দেশের জন্য করব।' ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

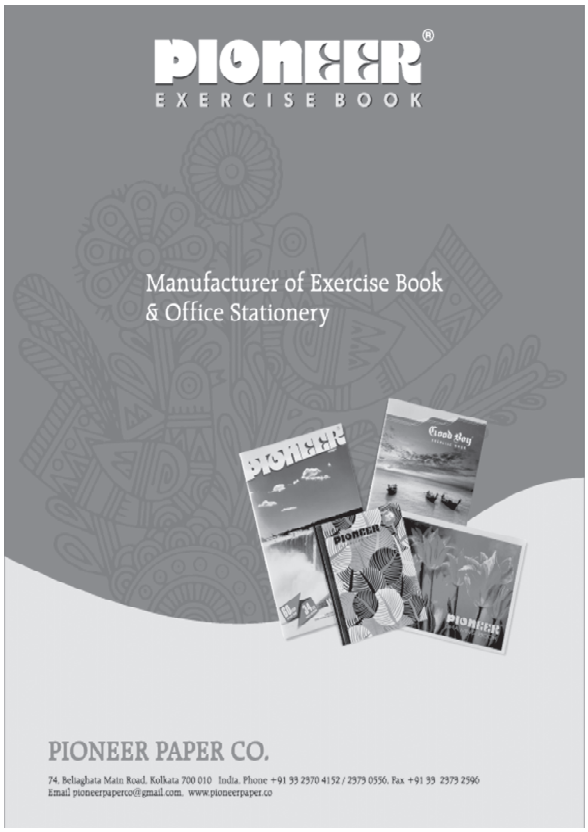

''কেউ কি কখনও এমন কোন মহান কথা শুনেছেন, যাঁকে কোন না কোন বাধা অতিক্রম করতে হয়নি? গুরু নানক এবং তাঁর মক্কা তীর্থে যাবার কাহিনীটি কে ভুলতে পারবে? সেখানে তিনি একদিন পবিত্র 'কাবা-প্রস্তরে' পা রেখে নিদ্রিত ছিলেন। এতে আচারনিষ্ঠ ধার্মিক মুসলমানরা ক্রোধে বিচলিত হলেন। তাঁরা সেখানে এসে গুরু নানককে জাগ্রত করে, যেখানে ঈশ্বর আছেন সেখানে পা রাখার স্পর্ধা দেখানো জন্য তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে বলে ভয় দেখালেন। শান্তভাবে সেই সন্ত বললেন, 'আহা, তোমরা আমায় সেই স্থান দেখিয়ে দাও, যেখানে ঈশ্বর নেই— যাতে সেখানেই আমি পা রাখতে পারি।' পরবর্তী কালে শত শত লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।''

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

কাশ্মীর নিয়ে ভারতীয় নেতাদের অবিমৃশ্যকারিতার এক কাহিনি

পুস্তক প্রসঙ্গ

কল্যাণভঞ্জ চৌধুরী

কুনাল চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'টিয়ারফুল প্যারাডাইস' গ্রন্থটির টিয়ারফুল প্যারাডাইস অর্থাৎ অশ্রুসিক্ত স্বর্গ বলাবাহুল্য কাশ্মীর। লেখক শ্রীচট্টোপাধ্যায় ১২টি নাতিবৃহৎ অধ্যায়ে প্রাচীনকাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত কাশ্মীরের কাহিনি বর্ণনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন এই নয়নলোভন স্বর্গ যা চিরকাল দেশ বিদেশের মানুষদের প্রশংসা অর্জন করেছিল তা ১৯৪৭ থেকে রুধিরাক্ত এবং ক্রন্দসী রাজ্যে পরিণত হয়েছে। লেখক প্রথম অধ্যায়ে কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সেখানকার অধিবাসী, বিভিন্ন এলাকার ভৌগোলিক পরিচয় দিয়ে গ্রন্থটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করেছেন। অসাধারণ তাঁর পর্যবেক্ষণী শক্তি যার প্রশংসা না করে পারা যায় না। সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে এক দেশ থেকে আর এক দেশের প্রসঙ্গ টেনেছেন যা তাঁর বিশাল পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন কাশ্মীরি মেয়েরা সুন্দরী, কিন্তু তাদের চোখ হিমাচল প্রদেশের কিন্নরী মেয়েদের মতো অত সুন্দর নয়। তাদের শরীরের গঠন মধ্য এশিয়দের মতো কিন্তু তাদের খাদ্যাভ্যাস ও ভাষায় হিন্দুস্থানী প্রভাব বিদ্যমান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভৌগোলিক পরিচয় দিতে ভোলেননি। লাডাক কাশ্মীরের বৃহত্তম জেলা। এই জেলা শুষ্ক, কারণ এখানের গড় বৃষ্টিপাত মাত্র ৭৫ মিমি। লেখকের কবি-মন থেকে থেকে উদ্ভাসিত হয়। লেখক বলছেন— 'অমরনাথ যাত্রার পথে পহেলগাঁও একটা বিশ্রামের স্থান। অবন্তিপুরার পর ছোট্ট খালের মতো লিডার সব সময় আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ব্যস্ত নদী রাস্তার সমান্তরালে চলেছে। স্থানীয় লোকেরা তাদের সেই নদীতে বাসন ধুচ্ছে। হাঁস সানন্দে সাঁতার কাটছে।'

কাশ্মীরে পর্যটক সমানে বাড়ছে। এই বিপুলসংখ্যক পর্যটকদের মধ্যে ইজরাইলিদের সংখ্যা কম নয়। তিনি এই সুযোগে জানিয়ে দিতে ভোলেননি যে, ভারত সরকার ইহুদি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে বহু পরে, অথচ ইহুদিরা অনেক আগে থেকেই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলে তাঁরা আনন্দ-উৎসবে মেতেছিলেন। ১৯৬১ সালে কবির জন্মবর্ষে তেল আভিভের একটা রাস্তার নামকরণ কবির নামে করেন।

সমস্ত গ্রন্থে কবি, ভূগোলবিদ, ঐতিহাসিক ও রাজনীতিকের ভারী সুন্দর মেলবন্ধন

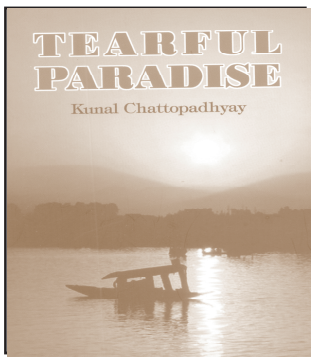

ঘটেছে। ইতিহাস, কাব্য, রাজনীতি ঘুরে ঘুরে এসেছে। লেখক প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, গান্ধী জাতির পিতা নন। ভারতীয়দের ইতিহাস বহু পুরাতন। শুধু তাই নয়, গান্ধী ভারত বিভাজনের প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁকে যদি ভারতের জাতির জনক বলতে হয় তবে তিনি পাকিস্তানেরও জনক। তাঁর যুক্তি অকাট্য।

শেষ পর্যায়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায় কাশ্মীরের দুঃখের কথা উল্লেখ করেছেন সবিস্তারে। যে কাশ্মীরের মানুষ রাজনীতির দাবা খেলার শিকার। কাশ্মীরের মহারাজা ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরকে ভারত ও পাকিস্তান থেকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী। কিন্তু পাকিস্তান ও ভারত কাশ্মীরের উপর তাদের কর্তৃত্ব রাখার পক্ষে এবং এই টানাপোড়েনের মধ্যে কাশ্মীর রুধিরাক্ত হতে লাগল। কাশ্মীরকে পুরোপুরি পাওয়ার জন্য পাকিস্তান কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের পাঠাতে লাগল। সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগ দিল মৌলবাদীরা। সন্ত্রাসবাদীরা অবিরত ভারতীয়দের আক্রমণ করতে লাগল, ভারতও পালটা জবাব দিতে লাগল। কাশ্মীর রক্তে রক্তে লাল হয়ে গেল। লেখকের হিসেবে ১৯৯০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত মোট ১৬,৯৪৮ সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়েছে, অসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে ১১, ১০৬। শ্রী চট্টোপাধ্যায় পরিষ্কার জানিয়েছেন, কাশ্মীরের দুঃখের মূলে আছে ভারতীয় নেতাদের অদূরদর্শিতা। লেখক জানিয়েছেন— ভারত সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতি বারের চুক্তিতে একের পর জমি হারিয়েছে।

মোট কথা, ১২০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ স্বর্ণখনি। এই গ্রন্থ না পড়লে কাশ্মীর সমস্যা অজানা থেকে যাবে, অজানা থেকে যাবে ভারতীয় নেতাদের অবিমৃশ্যকারিতার লজ্জাকর কাহিনি।

টিয়ারফুল প্যারাডাইস। লেখক : কুনাল চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক, পরম্পরা। কলকাতা, প্রকাশকাল-২০১২, পৃষ্ঠা-১২০। মূল্য : ১২৫ টাকা।

দ্বিতীয় গ্রন্থ রবি কুমার রচিত 'ইন্ডিয়ান হিরোইসম ইন ইজরাইল' প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ৯০০ ভারতীয় সৈন্যদের অটোমান তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র হয়ে যুদ্ধের অজানা কাহিনি। ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ সালে হালিফার যুদ্ধে এই ৯০০ সৈন্যের আত্মত্যাগের ফলে ইজরাইল রাষ্ট্র তৈরি হওয়া সম্ভব হয়েছিল। ইজরাইল সরকার প্রতি বছর ২২-২৩ সেপ্টেম্বর এই মহান যোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। লেখক শ্রীকুমার তাঁর গ্রন্থে জানিয়েছেন এই যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য হলো হতভাগ্য যোদ্ধারা শুধু তরোয়াল ও বর্শা হাতে যুদ্ধ করেছিলেন, অন্য ভারি কোনো অস্ত্র ছিল না। গ্রন্থটি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ইতিহাস-সাহিত্যে নতুন ও স্মরণীয় সংযোজন। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কাম্য।

ইন্ডিয়ান হিরোইসম ইন ইজরাইল— লেখক : রবি কুমার। প্রকাশক বিদ্যা ভারতী, সংস্কৃতি শিক্ষা সংস্থান, কুরুক্ষেত্র, প্রকাশকাল-২০১৬। পৃষ্ঠা-৫০। মূল্য : ৭০ টাকা।

ঈশ্বরপুরে দীপাবলী উপলক্ষে মাতৃসম্মেলন

গত ২ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ঈশ্বরপুর জেলার কানকি খণ্ডের চৌখরিয়ায় পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে দীপাবলী উপলক্ষে এক মাতৃসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে সভার শুভারম্ভ হয়। সভায় সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন গ্রামের বিশিষ্টা কৃষ্ণভক্ত গৃহবধূ শ্রীমতী সুচিত্রা সরকার। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মায়েদের ভূমিকা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা কুটুম্ব প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। তিনি রাষ্ট্র নির্মাণে

মায়েদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্মাণে গ্রামের মায়েরাও যে সহযোগী তা উল্লেখ করেন। গ্রামের মায়েরা এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে খুব উৎসাহিত হন। অনুষ্ঠানে ৩১০ জন মা-বোন উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি গ্রামের মায়েদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা শ্রীমতি রত্না বসাক।

অখিল ভারত হিন্দু মিলন-মন্দির প্রতিনিধি সম্মেলন

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গৌরবময় শতবর্ষ উপলক্ষে অখিল ভারত হিন্দু মিলন-মন্দির প্রতিনিধি সম্মেলন ২০১৬, মহাসমারোহে সম্পন্ন হয় গত ৪ থেকে ৬ অক্টোবর ওড়িশার পুরীশহরের পৌরসদন সভাগৃহে। সম্মেলনে সারাদেশ থেকে ২৫৬৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের শুরুতে ৩০০০ ভক্ত শোভাযাত্রা করে পুরী শহর পরিক্রমা করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ।

প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক রূপে ওড়িশার রাজ্যপাল ড. এম সি জামির, বিশেষ অতিথি হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তথা ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বেঙ্কট গোপাল গৌড়া এবং প্রধান বক্তারূপে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ বিশ্বনাথানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদিবসীয় সম্মেলনের অন্তিম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ওড়িশার মন্ত্রী মহেশ মহান্তি এবং পুরীর জেলাশাসক মধুসূদন দাস। সম্মেলনে ওড়িশার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ১ জন করে শিক্ষক, সমাজসেবী, নৃত্যকলাশিল্পী, বনবাসী উন্নয়ন

সমাবেশ সমাচার

প্রধান ও কারুশিল্পীকে সম্মানিত করা হয়। এছাড়া ১৬ দিব্যাঙ্গকে হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়।

তাজপুরে গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের উদ্যোগে ভাইফোঁটা

গত ৪ নভেম্বর দেশড়া গ্রামে এবং ৬ নভেম্বর তাজপুর গ্রামে মোট ১১০ জনের উপস্থিতিতে পাঠদান কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক- শিক্ষিকা ও গ্রাম বিকাশ সমিতির সদস্যদের উপস্থিতিতে ভাইফোঁটা উপলক্ষে মনোজ্ঞ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যক্রমে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বোনেরা ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে হাতে মিষ্টি তুলে দেয়। সমস্ত গ্রাম এক পরিবার এবং প্রত্যেকে পরস্পর ভাইবোন এই অনুভূতি সকলের মধ্যে অনুভূত হয়।

দেশড়া গ্রামে অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক ভোলানাথ পাত্র বলেন, সামাজিক সমরসতার বাস্তব রূপ আমরা এই কার্যক্রমের মাধ্যমে অনুভব করতে পারলাম। এই ধরনের কার্যক্রম প্রত্যেক গ্রামে হওয়া প্রয়োজন।

নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধজননী সভার পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

নবদ্বীপ বঙ্গবিবুধজননী সভার পরিচালনায় পণ্ডিত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ প্রণীত 'নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস' গ্রন্থের পুনঃ প্রকাশ গত ২৭ অক্টোবর পণ্ডিতপ্রবর বুনো রামনাথের ভিটায় পুরাতন রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের বড় হলঘরে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে

হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন 'দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি'র কার্যনির্বাহী সাধারণ সম্পাদক ড. রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ভাগবতভূষণ গোরাচাঁদ ভট্টাচার্য। বঙ্গবিবুধজননী সভার পক্ষ থেকে ড. রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে একটি মানপত্র ও মহাপ্রভুর মূর্তি স্মারক-উপহার প্রদান করা হয়। মানপত্র পাঠ করেন সভার সভাপতি ড. কুমারনাথ ভট্টাচার্য। সম্পাদক ড. অরুণ কুমার চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে জানান, এখন থেকে এই গ্রন্থ সভার কার্যালয়ে পাওয়া যাবে এবং কলকাতার সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ও সংস্কৃত বুক ডিপো-তেও এই গ্রন্থটি পাওয়া যাবে। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ড. হেমন্ত ভট্টাচার্য, অধ্যাপক কাশীনাথ মাপদার, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সকলেই বঙ্গবিবুধজননী সভার প্রাচীন ঐতিহ্য স্মরণ করে তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের প্রয়াস গ্রহণে যত্নবান হওয়ার জন্য উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন। রামকৃষ্ণবাবুও সোসাইটির পক্ষ থেকে কর্মশালা ও গ্রন্থপ্রকাশ ইত্যাদি বিষয়ে সর্বতোভাবে সাহায্যের আশ্বাস দেন। পরিশেষে সভার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তাপস ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে নবদ্বীপের মহান ঐতিহ্য উল্লেখে পাঁচালী পরিবেশন করেন কবি কমলেন্দু ভট্টাচার্য এবং কীর্তন পরিবেশন করেন শ্রীমতী সরস্বতী দাস।

শিলিগুড়িতে ভগিনী নিবেদিতা জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপন

গত ২৮ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিনে শিলিগুড়ি সারদা শিশুতীর্থ সূর্যসেন কলোনিতে উদ্‌যাপিত হলো নিবেদিতা জন্ম সার্ধশতবর্ষের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। দীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ভারতে প্রতি ভগিনী নিবেদিতার স্মরণীয় অবদানের নানা দিক আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজ, অধ্যাপিকা কৃষ্ণা দাস সেনগুপ্ত ও ভারত তত্ত্ববিদ শ্রীজীব ভট্টাচার্য এবং স্বামী শ্যামানন্দ মহারাজ। কথা ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নিবেদিতাকে চিত্রায়িত করেন স্বামী জীবনানন্দ মহারাজ (সাহুডাঙ্গীহাটের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম)। সারা বছর নিবেদিতার কর্মজীবন আদর্শ ও ভারতপ্রেমের কথা নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সকলের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে— 'ভগিনী নিবেদিতা জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি শিলিগুড়ি'। সমিতির সভাপতি স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজ, সম্পাদক শ্রীজীব ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক বিমলকৃষ্ণ দাস, কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ সাহা।

HOW ₹1000 SIP CAN GROW IN A LONG TERM!!

Year	5	10	15	20	25	30
Total Amt.	60,000	1,20,000	1,80,000	2,40,000	3,00,000	3,60,000
8%	77,172	201,458	401,621	723,987	1,243,160	2,079,293
12%	81,104	224,036	475,931	919,857	1,702,207	3,080,973
15%	87,342	263,018	616,366	1,327,079	2,756,561	5,631,770
20%	98,704	344,311	955,460	2,476,194	6,260,267	15,676,252

Fights Market Volatility

DRS INVESTMENT
Contact : 9830372090, 9748978406
Email : drsinvestment@gmail.com
PMS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

CALL TODAY AND START SIP INVESTMENT

uti UTI Mutual Fund | HDFC MUTUAL FUND | SBI MUTUAL FUND A PARTNER FOR LIFE

Mutual Fund Investment Subject to Market Risk.

শোকসংবাদ

মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের গড়কমলপুর গ্রামের স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি বিজন পাণিগ্রাহীর মাতৃদেবী

নীলিমারানি পাণিগ্রাহী গত ২৯ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। তিনি দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ৭ পুত্র ও পুত্রবধূ এবং ১১ জন নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাদপুর খণ্ড কার্যবাহ সঞ্জয় ঘোষের বাবা গজেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ২৭ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিম কোচবিহার জেলার জেলা সঙ্ঘচালক প্রবীর কুমার রায়ের পিতৃদেব গজেন্দ্রনাথ রায় গত ৩১ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

পশ্চিম কোচবিহার জেলার সহ-জেলা কার্যবাহ গৌতম তালুকদারের মাতৃদেবী নীলিমা তালুকদার দীর্ঘ রোগ ভোগের পর গত ৭ নভেম্বর ভোরবেলা প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ২ পুত্র, ৩ কন্যা রেখে গেছেন।

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র উৎসব কথাটা উঠলেই সারা বিশ্বের নৈসর্গিক রূপ ছাড়াও মানুষজনের জীবনযাপন, আনন্দ-বেদনা, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি মানবিক সম্পর্কের চিরকালীন টানাপোড়েনকে এক ছাতার তলায় প্রত্যক্ষ করার এক চমৎকার সুযোগের কথা মনে আসে। একেবারে পূর্বপ্রান্তের জাপানি ছবির পরেই যখন প্রায় নিস্তেজ সূর্যের স্যাঁতসেঁতে দেশ নরওয়ের ছবি পর্দায় ফুটে ওঠে তখন বাস্তবিকই পৃথিবী কতই না ছোট হয়ে আসে। সব মানুষ তো এক জীবনে বার বার বিশ্বভ্রমণ করতে পারেন না। বাৎসরিক চলচ্চিত্র উৎসব সে অভাব মিটিয়ে চলচ্চিত্রপ্রেমীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে ভাবী চলচ্চিত্রকারদের হালফিলের চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারা, কৃৎকৌশল সম্পর্কেও একেবারে হাতে গরম ধারণা গড়ে দেয়। এবারের ১১ থেকে ১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ২২তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে এমনই বহুবিধ সুযোগ থাকবে। নানান দেশের ১৬৫টি বাছাই ছবির পরিচালক, সঙ্গীতকার, আলোকচিত্রশিল্পী ও অন্য কলাকুশলীদের কাজ দেখার অভিজ্ঞতা চলচ্চিত্রমোদী ও শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষজন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবেন।

ভারতে চলচ্চিত্র উৎসবের অতীতটি কিন্তু ভারী চমকপ্রদ যা ভবিষ্যৎ ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণের দিকনির্দেশ দিয়ে দেয়। ১৯৫২ সালে কলকাতায় হওয়া সেই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে কোনো প্রতিযোগিতামূলক বিভাগ ছিল না। দেখানো হয়েছিল সারা বিশ্বের দিকপাল চলচ্চিত্রকারদের বিশ্বখ্যাত প্রচুর ছবি। দেশে তখন মোটামুটি সেটের মধ্যে আবদ্ধ অনেকটাই সুরেলা ঢঙের অভিনয়সমৃদ্ধ ছবিই দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য হাজির করা হোত। এরই মধ্যে কলকাতায় নিউ থিয়েটার্স ঘরানার বাইরের কয়েকজন মানুষ পরিচিত হতে চাইছিলেন সর্বাধুনিক ইউরোপীয়, হলিউড ও বিশ্ব চলচ্চিত্রের আঙ্গিকের সঙ্গে। তাঁরা কষ্টেসৃষ্টে কয়েকটি ফিল্ম ক্লাব চালাতেন। সেখানে নিয়ে আসতেন চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হওয়া ছবিগুলিকে।

সত্যজিৎ রায়

তপন সিংহ

ঠিক এই সময়েই এল কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব, যেন তৃষ্ণার্ত জমিতে ঝেঁপে এল জলধারা। সত্যজিৎ-য়ের ভাষায় ‘‘ফিল্ম উৎসব অনুষ্ঠিত হলো, তার সূত্রে গজিয়েও উঠল বিস্তর চলচ্চিত্র রসিক। ভারতবর্ষের প্রতিটি বড় শহরে উৎসবের অঙ্গ হিসেবে, বিস্তর ছবি তখন দেখানো হয়। সেই সময় এক হল্ থেকে অন্য হলে প্রায় পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছি আমরা। গড়পড়তায় রোজ তখন গোটা-চারেক করে ছবি দেখছি। ছবির বিচারে এ ছিল একটা সেরা উৎসব। কুরোসাওয়ার রসোমন, ডি সিকার মিরাকল ইন মিলান, রমে;সলিনির ওপেন সিটির মতো অসামান্য সব ছবি। জাপানের রসোমন দেখে মনে হলো অনেককাল ধরেই এমন উঁচুমানের ছবি তারা তৈরি করে যাচ্ছে।’’

সত্যজিৎ তখন ডি জে ফিমারে নাম করা কর্মাশিয়াল আর্টিস্ট, তিনি পেশা

হিসেবে চলচ্চিত্র নির্মাণ বেছে নেওয়া সম্পর্কে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু ''চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হবার পর আর এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সংশয় রইল না যে, আমি ছবিই তুলব। 'পথের পাঁচালি' হবে আমার প্রথম ছবি।''

এরপর কলকাতায় ৯ বছর পরে আবার ১৯৬১ সালে চলচ্চিত্র উৎসব হয়েছিল। কিন্তু '৫২ সালের কলকাতা উৎসব ভারতীয় চলচ্চিত্রের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পথের পাঁচালীর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। ঋত্বিক ঘটক নামে আরও একজন ঢ্যাঙা, রোগা কিন্তু চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বপ্নে বিভোর মানুষ এই চলচ্চিত্র উৎসব দেখেছিলেন সত্যজিতের পাশে বসে। অভিভূত হয়েছিলেন তিনিও। চলচ্চিত্র উৎসবের রাশিয়ান অতিথিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় চলচ্চিত্রপ্রেমী সরমা ঘটকের। ইনিই ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর সহধর্মিণী হন। ঋত্বিকের হাত থেকে আসে উৎসবের ফসল আনকোরা ভাবনার 'অযান্ত্রিক'। অনুপ্রাণিত তপন সিংহ ১৯৫৫ সালেই তৈরি করেন বিশ্বখ্যাত 'কাবুলিওয়ালা'। বিশ্ব চলচ্চিত্র দরবারে ভারত জায়গা করে নেয়। বিশ্বের চলচ্চিত্র উৎসবগুলির দেওয়া পুরস্কারগুলির কতই না নাম। ভেনিস উৎসবে সেরা ছবিকে দেওয়া হয় গোল্ডেন লাইয়ন, বার্লিনে আবার সিংহের বদলে আসে সোনার ভল্লুক। সর্বাপেক্ষা কৌলিন্যময় সিনেমা উৎসবে দেওয়া হয় Golden Palm (Palm d'or)। পথের পাঁচালী এখানেই প্রথম বিশেষ জুড়ী পুরস্কার পেয়েছিল। ভারতের সেরা ছবির পুরস্কার 'সোনালী' ময়ূর। এশিয়ার মধ্যে তেহেরানের উৎসব আর হয় না। তবে ম্যানিলার উৎসবের পরিচিতি আছে। এখানে অপর্ণা সেন ৩৬ নং চৌরঙ্গী লেনের জন্য পুরস্কৃত হন।

ঋত্বিক ঘটক

তবুও, এই নানান পশুপক্ষী পাতা খচিত পুরস্কার নিয়ে টানা-হেঁচড়া কম হয় না। এক শ্রেণীর দেশীয় পরিচালক আছেন তাদের ছবি দেশের মানুষ দেখুক না দেখুক, চলচ্চিত্র রস উপভোগ করুন না করুন তাঁর পরোয়া করেন না। তাঁরা বিশ্বের নানা উৎসব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তদ্বির বজায় রেখে দেশের Directorate of Flim Festival-এও লোকজন এর লবি সক্রিয় করে উল্লেখিত উৎসবগুলিতে ছবি পাঠিয়ে নিজেরাও বেড়িয়ে আসেন। দুর্গা পুজোয় উৎসর্গ করা প্রসাদের মতো তাঁরা ফেস্টিভ্যাল ছোঁয়ানো ছবি দেশের মানুষকে দেখানো পছন্দ করেন। অনেক সময় এমনটাও হয় সেই মহার্ঘ ছবি আর দেশে প্রদর্শিতই হয় না। দেখাবার প্রদর্শকই পাওয়া যায় না। এমনই মহান তাঁদের সৃষ্টিকর্ম।

এক বিরল কেশ, বামপন্থী পরিচালক এখনও এই একই কাজ করে চলেছেন। আবার অন্যদিকে উৎসবের মুখাপেক্ষী না থেকে আজকাল বহু পরিশীলিত চলচ্চিত্রকার দর্শকদের নানান রুচির কথা মাথায় রেখে চিত্ররূপময় সব ছবি উপহার দিচ্ছেন। কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম কর্ণধার গৌতম ঘোষ যেমন দর্শকপ্রীতি ধন্য তেমনি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারেও ভূষিত। বলা প্রয়োজন আজকের অনীক দত্তের 'ভূতের ভবিষ্যৎ', শিবপ্রসাদের 'রামধনু' বা 'বেলাশেষে' বিপুল দর্শক প্রশংসাধন্য হওয়ার পর বিদেশেও দেখানো হচ্ছে। কমলেশ্বর মুখার্জির চাঁদের পাহাড় যে-কোনো বিশ্বমানের উৎসবে পাল্লা নিতে পারে। চলচ্চিত্র উৎসবের একটা বাণিজ্যিক বিভাগ থাকে এই সব পরিচালকরা সেখানে স্বাগত হবেন। শুধু পুরস্কারের খাতিরে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রযোজক তথা চলচ্চিত্র শিল্পের কোনো কাজে লাগে না। কেননা তাঁদের ছবি সাধারণত ফ্লপ করায় প্রযোজক আর পরের ছবি করার ভরসা পান না।

এঁরা চিরকালই থাকবেন তবু আজকাল যতই টিভি, ইউটিউব বা ডিভিডি-র রমরমা হোক না কেন চলচ্চিত্র উৎসবের রোশনাই, জৌলুস, আনকোরা ছবি দেখার অনুভবই আলাদা। তাকে ম্লান করা মুশকিল। ভাইফোঁটা, দেওয়ালিতে যেমন অনেক লুপ্তপ্রায় মিষ্টান্নের সঙ্গে নতুন নতুন মিষ্টির উদ্ভাবন হয়, তেমনি চলচ্চিত্র উৎসবের বিশেষত্বই থাকে Retro-spective বিভাগে। অতীত গরিমাময় পরিচালকদের সৃষ্টি কর্মগুলি পুনঃ প্রত্যক্ষ করার এমন সুযোগ চট করে পাওয়া যায় না। আর সারা বিশ্বের সাম্প্রতিকতম চলচ্চিত্র দর্শনজনিত আকর্ষণের রকমফের হতে পারে কিন্তু বরাবরই তা থাকবে। থাকবে উৎসবে ছবি পাঠানো, সেন্সার করা নিয়ে পরিচালকদের তৎপরতা। উৎসবের প্রদর্শিত হওয়া বা পুরস্কৃত হওয়া চলচ্চিত্রকার, অভিনেতার সারাজীবনের তকমা। 'কান' দিয়ে শুরু করেছিলাম। সদ্য সমাপ্ত ৬৮তম (২০১৫) কান উৎসবে পুরস্কৃত হয়ে এল ভারতের নীরজ ধাওয়ান পরিচালিত বেনারসের শ্মশান কেন্দ্রিক 'মশান' ছবিটি। এটি সত্যজিতের মতো পরিচালকেরও প্রথম ছবি। ধারা প্রবহমান। উৎসব চলুক। ■

শব্দরূপ-৮০৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			■	■	
■	■		■	৬	৭	■	■
■	■	৮	৯	■		■	■
১০	■	■	১১			■	১২
	■	■		■		■	
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. কৈকেয়ীর কুব্জা দাসী, **৩.** 'আট-এ — ' (শতকিয়া), **৫.** চার ক্রোশ, **৬.** 'যত মত, — পথ', **৮.** পুরাণোক্ত চতুর্থ যুগ, **১১.** কপিশ, কপিল, **১৩.** যার পেট বড়; গণেশ, **১৪.** অশ্বারোহী সৈন্যদল।

উপর-নীচ : ১. বাসুকির ভগিনী, জরৎকারু-পত্নী, **২.** বরকন্যার জন্মরাশি ইত্যাদির মিল (অতিশয় শুভসূচক), **৩.** পতিত ('— জাতি'), **৪.** রামায়ণে বানরদের মধ্যে চিকিৎসক, **৭.** 'দে মা আমায় — '; কোষরক্ষকের কাজ, **৯.** লেখক, **১০.** মৃতদেহাশ্রয়ী প্রেত, **১২.** ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত সত্যকাম-জননী।

সমাধান
শব্দরূপ-৮০৬
সঠিক উত্তরদাতা
হিতেন মাহাতো
রানিবাঁধ, বাঁকুড়া
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
পার্থ সেন
ঝালদা, পুরুলিয়া

ভা	■	■	সু	যো	ধ	ন	■
র	■	■	যে	■	নে	■	■
বি	ভী	ষ	ণ	■	শ	কু	নি
■	ম	■	■	■	■	পো	■
■	র	■	■	■	■	কা	■
সু	তি	কা	■	সু	প্র	ত	র
■	■	লি	■	তা	■	■	ক্তি
■	ই	ন্দী	ব	র	■	■	কা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৮০৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় ভুল হলো, তাতে ভারতের পরিস্থিতি বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হয় না। না করা হয় ভারতের উপকরণের ভাবনা আর না করা হয় তার প্রয়োজনের। তা হয় রাশিয়া ও ইউরোপের শিল্প-বাণিজ্য অনুকরণের ক্ষীণ প্রয়াস মাত্র। তাতেও সেই দেশের সামনে শিল্পায়নের সময়ে এবং তার ফলস্বরূপ যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তারও কোনো চিন্তাভাবনা করা হয়নি। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য ও সমন্বয় করাই হয়নি। যে-কোনো পরিকল্পনা পূর্ণ করার জন্য শুধু অর্থের যোগানই নয়, মানবসম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সমস্ত মনোযোগ শুধু অর্থপ্রাপ্তির উপায় খুঁজতে ও ব্যয়ের পরিমাণ অনুসারে সাফল্যের স্বপ্ন দেখাতেই চলে গেছে। ন্যূনতম ব্যয়ে অধিকতম লাভের কথাই ভুলে গেছি। যেখানে মানুষের উন্নতিকে লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল সেখানে আমরা পার্থিব উন্নতিকে লক্ষ্য রেখে অর্থকে তার ভিত্তি মনে করেছি।

* * *

পরিকল্পনাকারীরা শুধু একটি কথাই বলছেন যে, জনসাধারণের বিশাল চাহিদার তুলনায় পরিকল্পনা খুবই ছোট। কিন্তু প্রাথমিকতা নির্ধারণ করার সময় অথবা আঞ্চলিক যোজনাগুলি প্রস্তাবিত করার সময় তাঁরা একটি কথা খুব সহজেই ভুলে যান। ভারী শিল্পের ওপর জোর দিয়ে, দেশের উপভোক্তাদের তাদের প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত করে, রপ্তানি বাড়ানোর কথা বলে এবং উপভোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নতুন কর বসিয়ে পরিকল্পনাকারীরা জনসাধারণের বিপুল চাহিদার বদলে অন্য কোনো বিষয়েই খেয়াল রাখেন। উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি প্রয়োজনগুলি এবং উৎকৃষ্ট জীবনস্তরের জন্য জন-আকাঙ্ক্ষা পূর্তির তাৎক্ষণিক চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ১১

থাকে যদি ডাটা জমে যায় রান্নাটা
DUTA
SPICE POWDER & PAPAD
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
TURMERIC POWDER
CUMIN POWDER
TURMERIC POWDER
CORIANDER POWDER
RED CHILLI POWDER
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
Regd. Office : 207, Maharshi Debendra Road, Kolkata - 700007
Contact : (M) 98366-72200 / (033) 2259-1796/5548
Email : dutaspice@gmail.com | Website : www.dutaspices.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
14 November - 2016 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com ।। দাম ১০ টাকা ।।